মাধ্যমিক বাংলা সংকলন
কবিতা

নবম-দশম শ্রেণী

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড
ঢাকা

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক ১৯৯৬ শিক্ষাবর্ষ
থেকে নবম-দশম শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্ধারিত

মাধ্যমিক বাংলা সংকলন

কবিতা

নবম-দশম শ্রেণী

সংকলন ও ভূমিকা
মাহবুবুল আলম
ড. মঞ্জুশ্রী চৌধুরী
শামসুল কবীর

সম্পাদনা
ড. মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা

প্রসঙ্গ কথা

শিক্ষার উন্নয়ন ব্যতীত জাতীয় উন্নয়ন সম্ভব নয়। স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশের উন্নয়নের ধারায় জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা, আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনপ্রবাহ যাতে পাঠ্যপুস্তকে প্রতিফলিত হয়, সেই লক্ষ্যে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি প্রণয়ন কমিটির সুপারিশক্রমে আশির দশকের প্রারম্ভে প্রবর্তিত হয় নিম্ন-মাধ্যমিক ও মাধ্যমিক স্তরের নতুন পাঠ্যপুস্তক। দীর্ঘ এক যুগেরও বেশি সময় ধরে এই পাঠ্যপুস্তকগুলো প্রচলিত ছিল।

উন্নয়নের ধারায় ১৯৯৪ সালে নিম্ন মাধ্যমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাক্রম সংস্কার, পরিমার্জন ও বাস্তবায়নের জন্য "শিক্ষাক্রম প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন সম্পর্কিত টাস্কফোর্স" গঠিত হয়। ১৯৯৫ সালে নতুন শিক্ষাক্রম অনুযায়ী পর্যায়ক্রমে ৬ষ্ঠ থেকে ৯ম শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তক রচিত হয়। সময়ের সাথে সাথে দেশ ও সমাজের চাহিদা পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে ২০০০ সালে নিম্ন-মাধ্যমিক ও মাধ্যমিক স্তরের প্রায় সকল পাঠ্যপুস্তক উচ্চ পর্যায়ের বিশেষজ্ঞদের দ্বারা যৌক্তিক মূল্যায়নের মাধ্যমে পুনরায় সংশোধন ও পরিমার্জন করা হয়। ২০০৮ সালে শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক গঠিত শিক্ষাবিষয়ক টাস্কফোর্সের সুপারিশে প্রচ্ছদ প্রণয়ন, বানান ও তথ্যগত বিষয় সংশোধনসহ পাঠ্যপুস্তক আকর্ষণীয় করা হয়েছে। আশা করা যায় এতে করে পাঠ্যপুস্তকটি শিক্ষক-শিক্ষার্থীর নিকট আরো গ্রহণযোগ্য ও সময়োপযোগী বলে বিবেচিত হবে।

শিক্ষাক্রমের আলোকে মূল্যায়নকে আরো ফলপ্রসূ করার জন্য দেশের সুধীজন ও শিক্ষাবিদগণের পরামর্শের প্রেক্ষিতে সরকারি সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রতিটি অধ্যায়শেষে বহুনির্বাচনি ও সৃজনশীল প্রশ্ন সংযোজন করা হয়েছে। প্রত্যাশা করা যায়, এতে শিক্ষার্থীর মুখস্থনির্ভরতা বহুলাংশে হ্রাস পাবে এবং শিক্ষার্থী তার অর্জিত জ্ঞান ও অনুধাবন বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করতে বা যে কোনো বিষয়কে বিচার-বিশ্লেষণ অথবা মূল্যায়ন করতে পারবে।

মাধ্যমিক স্তরে বাংলা একটি আবশ্যিক বিষয়। বাংলা আমাদের মাতৃভাষা, রাষ্ট্রভাষা এবং শিক্ষার মাধ্যম। এছাড়া ৫২-র ভাষা-আন্দোলনের প্রেক্ষিতে এ ভাষাকে কেন্দ্র করে ২১শে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা-দিবস হিসেবে ঘোষিত হয়ছে। ফলে বাংলা ভাষার মর্যাদা এখন বিশ্বপরিসরে ব্যাপ্ত। সুতরাং এখন এ ভাষার ব্যবহারিক দিকে ব্যুৎপত্তি অর্জন যেমন প্রয়োজন তেমনি সৃষ্টিশীলতায় দক্ষতা ও কুশলতা অর্জনও গুরুত্বপূর্ণ। অন্যদিকে শিক্ষার্থীর ধর্মীয়, সামাজিক ও মানবিক মূল্যবোধের বিকাশ যেমন প্রয়োজন, তেমনি তাকে হতে হবে দেশপ্রেম ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ। আমরা আশা করি, নবম-দশম শ্রেণীর বাংলা পাঠ্যপুস্তক 'মাধ্যমিক বাংলা সংকলন'-এ বর্তমান শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচির উদ্দেশ্যগুলো যথাযথভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। শিক্ষার্থীরা যাতে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস ও চেতনা সম্পর্কে যথাযথ ধারণা লাভ করে, তার প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রেখে কিছু বিষয়বস্তু সংযোজন করা হয়েছে।

আমরা জানি, শিক্ষাক্রম উন্নয়ন একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া এবং এর ভিত্তিতে পাঠ্যপুস্তক রচিত হয়। কাজেই পাঠ্যপুস্তকের আরো উন্নয়নের জন্য যেকোনো গঠনমূলক ও যুক্তিসংগত পরামর্শ গুরুত্বের সাথে বিবেচিত হবে। ২০২১ সালে স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীতে প্রত্যাশিত সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তোলার নিরন্তর প্রচেষ্টার সঙ্গী হিসেবে শিক্ষার্থীদের সুষ্ঠু বিকাশে বর্তমান সংস্করণে মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত ইতিহাস ও চেতনা প্রতিস্থাপিত হয়েছে। অতি অল্প সময়ের মধ্যে পরিমার্জিত পাঠ্যপুস্তকগুলো প্রকাশ করতে গিয়ে কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে যেতে পারে। পরবর্তী সংস্করণে পাঠ্যপুস্তকগুলো আরো সুন্দর, শোভন ও ত্রুটিমুক্ত করার চেষ্টা অব্যাহত থাকবে।

যাঁরা এ পাঠ্যপুস্তকটি রচনা, সম্পাদনা, যৌক্তিক মূল্যায়ন, সৃজনশীল প্রশ্ন প্রণয়ন ও প্রকাশনার কাজে আন্তরিকভাবে মেধা ও শ্রম দিয়েছেন, তাঁদের জানাই ধন্যবাদ। যাদের জন্য পাঠ্যপুস্তকটি প্রণীত হল, আশা করি তারা উপকৃত হবে।

প্রফেসর মোঃ মোস্তফা কামালউদ্দিন
চেয়ারম্যান
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড ঢাকা।

সূচিপত্র

বন্দনা

শাহ মুহম্মদ সগীর

[**কবি -পরিচিতি:** শাহ মুহম্মদ সগীর আনুমানিক ১৪-১৫শ শতকের কবি। মুসলমান কবিদের মধ্যে তিনিই প্রাচীনতম। তিনি গৌড়ের সুলতান গিয়াসউদ্দিন আজম শাহের রাজত্বকালে (১৩৮৯-১৪১১ খ্রিষ্টাব্দ) *ইউসুফ জোলেখা* কাব্য রচনা করেন। কাব্যটি পঞ্চদশ শতকের প্রথম দশকে রচিত হয়েছিল বলে অনুমান করা হয়। কাব্যের রাজবন্দনায় 'মহামতি গ্যেছ' বলে যাঁকে উল্লেখ করা হয়েছে তিনি গিয়াসউদ্দিন আজম শাহ বলে অনুমিত। কবির 'শাহ' উপাধি থেকে অনুমান করা হয় যে, তিনি কোনো দরবেশ বংশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাঁর কাব্যে চট্টগ্রাম অঞ্চলের কতিপয় শব্দের ব্যবহার লক্ষ করে ড. মুহম্মদ এনামুল হক তাঁকে চট্টগ্রামের অধিবাসী বলে বিবেচনা করেছেন। কাব্যের রাজবন্দনায় 'মুহম্মদ সগীর তান আজ্ঞার অধীন'–এ কথা থেকে ধারণা করা হয় যে তিনি হয়তো সুলতানের কর্মচারী ছিলেন। কিংবা কাব্যচর্চায় তাঁর পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছিলেন। শাহ মুহম্মদ সগীর তাঁর *ইউসুফ জোলেখা* কাব্যে দেশি ভাষায় ধর্মীয় উপাখ্যান বর্ণনা করতে চেয়েছিলেন, তবে কাব্যে ধর্মীয় পটভূমি থাকলেও তা হয়ে উঠেছে মানবিক প্রেমোপাখ্যান। তাঁর কাব্যের শিল্পমূল্য অতুলনীয়।]

দ্বিতীয়ে প্রণাম করোঁ মাও বাপ পাএ।
যান দয়া হন্তে জন্ম হৈল বসুধায় ॥
পিঁপিড়ার ভয়ে মাও না থুইলা মাটিত।
কোল দিআ বুক দিআ জগতে বিদিত ॥
অশক্য আছিলুঁ মুই দুর্বল ছাবাল।
তান দয়া হন্তে হৈল এ ধড় বিশাল ॥
না খাই খাওয়াএ পিতা না পরি পরাএ।
কত দুক্ষে একে একে বছর গোঞাএ ॥
পিতাক নেহায় জিউ জীবন যৌবন।
কনে না সুধিব তান ধারক কাহন ॥
ওস্তাদে প্রণাম করোঁ পিতা হন্তে বাড়।
দোসর-জনম দিলা তিঁহ সে আম্মার ॥
আম্মা পুরাবাসী আছ জথ পৌরজন।
ইষ্ট মিত্র আদি জথ সভাসদগণ ॥
তান সভান পদে মোহার বহুল ভকতি।
সপুটে প্রণাম মোহার মনোরথ গতি ॥
মুহম্মদ সগীর হীন বহোঁ পাপ ভার।
সভানক পদে দোয়া মাগোঁ বার বার ॥

অনুশীলনমূলক কাজ

উৎস

শাহ মুহম্মদ সগীরের *ইউসুফ জোলেখা* কাব্যের 'বন্দনা'-পর্ব থেকে গৃহীত এই কবিতাংশ 'বন্দনা' নামে সংকলিত হয়েছে। বন্দনা-পর্ব যথেষ্ট বড়, এখানে শুধু গুরুজনদের প্রতি বন্দনার অংশটুকু স্থান পেয়েছে।

মূলবক্তব্য

কবি তাঁর মূল কাব্যের প্রারম্ভে সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর প্রশংসা করেছেন, সংকলিত এই কবিতাংশে জন্মদাতা পিতামাতা ও জ্ঞানদাতা শিক্ষকের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন। পিতামাতা অশেষ দুঃখকষ্ট স্বীকার করে পরম যত্নে সন্তানকে বড় করে তোলেন। শিক্ষক জ্ঞানদান করে তাকে মানুষ হিসেবে গড়ে তোলেন। তাই তাঁদের প্রতি অফুরন্ত শ্রদ্ধা দেখাতে হবে। কবি তাঁর কাব্যরচনায় সাফল্যলাভের জন্য সবার কাছে দোয়া কামনা করেছেন।

শব্দার্থ ও টীকা

পুরাবাসী– নগরবাসী। **বন্দনা** – স্তুতি, প্রশংসা। **করোঁ** – করি। **যান** – যার। **হন্তে** – হতে, থেকে। **থুইল** – রাখল। **অশক্য** – অশক্ত, দুর্বল। **আছিলুঁ** – ছিলাম। **মুই** – আমি। **ছাবাল** – ছাওয়াল, ছেলে, সন্তান। **তান** – তাঁর। **গোঞাএ** – গুজরান করে, অতিবাহিত হয়। **পিতাক** – পিতাকে। **নেহায়** – স্নেহে। **জিউ** – আয়ু, জীবিত থাকি। **কনে** – কখনও। **ধারক** – ধারের, ঋণের। **কাহন** – ষোলপণ, টাকা। **বাড়** – বাড়া, বেশি। **দোসর** – দ্বিতীয়। **মোহার** –আমার। **সপুটে** – করজোড়ে। **সভান** – সবার। **সভানক** – সবার। **বসুধায়** – পৃথিবীতে। **তিঁহ** – তিনিও। **আহ্মার** – আমার। **বিদিত** – জানা। **মনোরথ** – ইচ্ছা, অভিলাষ। **পিঁপিড়ার ভয়ে মাও না থুইলা মাটিত** – মায়ের স্নেহমমতার তুলনা নেই। মায়ের সদাজাগ্রত কল্যাণদৃষ্টি সন্তানের জীবনপথের পাথেয় স্বরূপ। শিশুকে মা বহু যত্নে লালন-পালন করেন। পিঁপড়ার ভয়ে মা সন্তানকে মাটিতে রাখেননি – একথা উল্লেখ করে কবি মায়ের সেই স্নেহমমতা ও কল্যাণদৃষ্টিকেই বড় করে তুলেছেন। **অশক্য আছিলুঁ মুই দুর্বল ছাবাল** – এখানে কবি মানবশিশুর শৈশবকালীন অসহায় অবস্থার প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। মায়ের আদর-যত্ন ও পরিচর্যা লাভ করে শিশু ধীরে ধীরে পরিণত মানুষ হয়ে ওঠে। কবি তাঁর স্নেহময়ী মায়ের প্রতি শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশের উদ্দেশ্যে এই পঙ্ক্তিটি ব্যবহার করেছেন।

টীকা : মনোরথ = মনরূপ রথ – রূপক কর্মধারয় সমাস।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. 'নেহায়' শব্দটির শাব্দিক অর্থ কী ?

ক. অতিবাহিত করা খ. স্নেহ
গ. দেখে ঘ. দুর্বল

২. 'বন্দনা' কবিতায় ব্যবহৃত কিছু শব্দ উদ্ধৃত করা হল-

i. পুরাবাসী, অশক্য, জিউ
ii. তিঁহ, ধারক, কাহন
iii. আদ্যমূল, প্রকটিল, সভান

কোন গুচ্ছের সবকটি শব্দ কবিতায় ব্যবহৃত হয়নি ?

ক. i　　খ. i ও ii
গ. iii　　ঘ. ii ও iii

উদ্ধৃত অংশটি পড়ে নিচের ৩, ৪ ও ৫ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও।

পিঁপিড়ার ভয়ে মাও না থুইলা মাটিত।
কোল দিআ বুক দিআ জগতে বিদিত।।
অশক্য আছিলুঁ মুই দুর্বল ছাবাল।
তান দয়া হন্তে হৈল এ ধড় বিশাল।।

৩. উদ্ধৃতাংশে জীবনের কোন সময়ের কথা বলা হয়েছে ?

ক. অসহায় শৈশবের　　খ. রুগ্ণ অবস্থার
গ. চঞ্চল কৈশোরের　　ঘ. বয়ঃসন্ধিক্ষণের

৪. উদ্ধৃতাংশে প্রকাশ পেয়েছে মায়ের-

ক. সীমাহীন সতর্কতা　　খ. সচেতন পরিচর্যা
গ. নির্ভেজাল বাৎসল্য　　ঘ. কর্তব্য পরায়ণতা

৫. উদ্ধৃতাংশে কবি মনের কোন দিকটির প্রতিফলন ঘটেছে ?

i. মা-বাবার প্রতি আন্তরিকতা
ii. মা-বাবার প্রতি আন্তরিকতা ও শ্রদ্ধা
iii. মা-বাবার প্রতি শ্রদ্ধাবোধ ও কৃতজ্ঞতা

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i　　খ. i ও ii
গ. iii　　ঘ. i ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. উদ্ধৃত অংশটি পড় এবং সে আলোকে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

না খাই খাওয়াএ পিতা না পরি পরা এ।
কত দুক্ষে একে একে বছর গোঞা এ।।
পিতাক নেহায় জিউ জীবন যৌবন।
কনে না সুধিব তান ধারক কাহন।।
ওস্তাদে প্রণাম করোঁ পিতা হন্তে বাড়।
দোসর জনম দিলা তিঁহ সে আম্মার।।

ক. উদ্ধৃত কবিতাংশটি কোন কবির কবিতা থেকে নেওয়া হয়েছে ?
খ. কবি পিতার ঋণকে অপরিশোধ্য বলে মনে করেছেন কেন ?
গ. উদ্দীপকে পিতা ও ওস্তাদের প্রতি ভক্তির যে পরিচয় পাওয়া যায় তার ভিত্তিতে ওস্তাদ যে পিতার চেয়েও বড় তা প্রমাণ কর।
ঘ. 'দোসর-জনম দিলা তিঁহ সে আম্মার।'–কীভাবে? বিশ্লেষণ কর।

হাম্‌দ্‌

আলাওল

[**কবি-পরিচিতি :** সৈয়দ আলাওল আনুমানিক ১৬০৭ খ্রিস্টাব্দে চট্টগ্রাম জেলার ফতেয়াবাদের অন্তর্গত জোবরা গ্রামে, মতান্তরে ফরিদপুরের ফতেয়াবাদ পরগনায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ছিলেন ফতেয়াবাদের শাসনকর্তা মজলিশ কুতুবের অমাত্য। জলপথে চট্টগ্রাম যাওয়ার সময় আলাওল ও তাঁর পিতা পর্তুগিজ জলদস্যুদের দ্বারা আক্রান্ত হন। যুদ্ধে পিতা নিহত হলে আলাওল পর্তুগিজ জলদস্যুদের হাতে পড়ে আরাকানে নীত হন। সেখানে তিনি আরাকানরাজ সাদ উমাদারের দেহরক্ষী অশ্বারোহী সেনাদলে চাকরি লাভ করেন। রাজমন্ত্রী মাগন ঠাকুর তাঁর বিদ্যাবুদ্ধি ও প্রতিভার পরিচয় পেয়ে তাঁকে পৃষ্ঠপোষকতা দান করেন। তিনি সপ্তদশ শতকের শ্রেষ্ঠ কবি হিসেবে বিবেচিত। তিনি আরবি, ফারসি, হিন্দি ও সংস্কৃত ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। এছাড়া তিনি রাগসংগীত, যোগ ও ভেষজশাস্ত্র, সুফিতত্ত্ব ও বৈষ্ণব সাধনা ইত্যাদি বিষয়ে পারদর্শী ছিলেন। আলাওলের যেসব গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া গেছে সেগুলো হল **:** *পদ্মাবতী, সয়ফুলমুলুক বদিউজ্জামাল, হপ্তপয়কর, সেকান্দরনামা, তোহফা* ইত্যাদি। এ ছাড়া তিনি কবি দৌলত কাজীর অসমাপ্ত কাব্য *সতীময়না ও লোরচন্দ্রানী*র শেষাংশ রচনা করেন। আলাওলের কাব্য অনুবাদমূলক হলেও তা মৌলিকতার দাবিদার। আলাওল আনুমানিক ১৬৭৩ সালে মৃত্যুবরণ করেন।]

বিছমিল্লা প্রভুর নাম আরম্ভ প্রথম।
আদ্যমূল শির সেই শোভিত উত্তম ॥
প্রথমে প্রণাম করি এক করতার।
যেই প্রভু জীবদানে স্থাপিল সংসার ॥
করিল প্রথম আদি জ্যোতির প্রকাশ।
তার প্রীতি প্রকটিল সেই কবিলাস ॥
সৃজিলেক আগুন পবন জল ক্ষিতি।
নানা রঙ্গ সৃজিলেক করি নানা ভাঁতি ॥
সৃজিল পাতাল মহী স্বর্গ নর্ক আর।
স্থানে স্থানে নানা বস্তু করিল প্রচার ॥
সৃজিলেক সপ্ত মহী এ সপ্ত ব্রহ্মাণ্ড ॥
চতুর্দশ ভুবন সৃজিল খণ্ড খণ্ড ॥
সৃজিলেক দিবাকর শশী দিবারাতি।
সৃজিলেক নক্ষত্র নির্মল পাঁতিপাঁতি ॥
সৃজিলেক শীত গ্রীষ্ম রৌদ্র ছায়া আর।
করিল মেঘের মাঝে বিদ্যুৎ সঞ্চার ॥
সৃজিল সমুদ্র মেরু জলচরকুল।
সৃজিল সিপিতে মুক্তা রত্ন বহু মূল ॥
সৃজিলেক বন তরু ফল নানা স্বাদ।
সৃজিলেক নানা রোগ নানান ঔষধ ॥
সৃজিয়া মানব-রূপ করিল মহৎ।
অন্ন আদি নানাবিধ দিয়াছে ভুগত ॥

সৃজিলেক নৃপতি ভুঞ্জয় সুখে রাজ।
হস্তী অশ্ব নর আদি দিছে তারে সাজ ॥
সৃজিলেক নানা দ্রব্য এ ভোগ বিলাস।
কাকে কৈল ঈশ্বর কাকে কৈল দাস ॥
কাকে কৈল সুখ ভোগে সতত আনন্দ।
কেহ দুঃখী উপবাসী চিন্তাযুক্ত ধন্ধ ॥
আপনা প্রচার হেতু সৃজিল জীবন।
নিজ ভয় দর্শাইতে সৃজিল মরণ।
কাকে কৈল ভিক্ষুক কাকে কৈল ধনী।
কাকে কৈল নির্গুণী, কাকে কৈল গুণী ॥

অনুশীলনমূলক কাজ

উৎস

'হাম্‌দ্' কবিতাংশটি আলাওলের *পদ্মাবতী* কাব্য থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। এটি *পদ্মাবতী* কাব্যের প্রারম্ভে মহান আল্লাহর প্রশংসাসূচক পর্বের অংশ।

মূলবক্তব্য

কবি এই কবিতাংশে বিশ্বসৃষ্টির রহস্য সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন। কবি মহান স্রষ্টার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে তাঁর সৃষ্টির মহিমা বর্ণনা করেছেন। আগুন, বাতাস, পানি ও মাটি এসব উপাদান সহযোগে আল্লাহ এই বিশাল বিশ্ব সৃষ্টি করেছেন। তারপর জলচর, প্রাণী, কীটপতঙ্গ, বৃক্ষলতা, পশুপাখি এবং সবশেষে সৃষ্টি করেছেন মানুষ। স্রষ্টার সৃষ্টির মধ্যে মানুষই শ্রেষ্ঠ। মানুষের উপভোগের জন্য বিচিত্র উপকরণ প্রদান করা হয়েছে। বিধাতা মানুষকে ভাগ্যের অধীন করে পার্থিব জীবনে সুখী কিংবা দুঃখী, গুণী কিংবা নির্গুণ করে পাঠিয়েছেন।

শব্দার্থ ও টীকা

হাম্‌দ্ – সাধারণ অর্থ : প্রশংসা, বিশেষ অর্থ : আল্লাহর প্রশংসা। **বিছমিল্লা** – আল্লাহর নামে শুরু করা, কোনো কাজ শুরু করার আগে মুসলমানেরা 'বিসমিল্লাহ' বলেন। পূর্ণ বাক্যটি হল : বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম। অর্থ : আমি পরম দয়ালু আল্লাহর নামে আরম্ভ করছি। **করতার** – কর্তা, প্রভু। **প্রকটিল** – প্রকাশ করল। **কবিলাস** – কৈলাস বা স্বর্গ। **ক্ষিতি** – মাটি। **সপ্ত মহী** – সাত-স্তর-বিশিষ্ট পৃথিবী। **নর্ক** – নরক। **সপ্ত ব্রহ্মাণ্ড** – সাত-স্তর- বিশিষ্ট আকাশ। **চতুর্দশ ভুবন** – পৃথিবীর সাত স্তর এবং আকাশের সাত স্তর মিলে চতুর্দশ ভুবন। **দিবাকর** – সূর্য। **শশী** – চাঁদ। **পাঁতিপাঁতি** – পঙ্‌ক্তিতে পঙ্‌ক্তিতে। **সিপিতে** – ঝিনুকে। **ভুঞ্জয়** – ভোগ করে। **ভাঁতি** – শোভা, **ভুগত** – ভোগ করতে, **দর্শাইতে** – দেখাতে।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. আল্লাহ জীবন সৃষ্টি করেছেন কেন ?
   ক. নিজের বন্দেগী করার জন্য
   খ. সৃষ্টির সেবা করার জন্য
   গ. নিজেকে জাহির করার জন্য
   ঘ. নিজের প্রতিনিধিত্ব করার জন্য

২. নিচের 'হাম্‌দ্' কবিতায় ব্যবহৃত কতিপয় শব্দের অর্থ দেওয়া হলো–
   i. মাটি, সূর্য, শোভা, ঝিনুক
   ii. প্রশংসা, প্রকাশ করল, পৃথিবী, চাঁদ
   iii. শোভা, কৈলাস, নরক, মাটি

কোন গুচ্ছ ক্ষিতি, দিবাকর, ভাঁতি, সিপি শব্দের অর্থ ?

ক. i   খ. i ও ii
গ. ii ও iii   ঘ. iii

উদ্ধৃত অংশটি পড়ে নিচের ৩, ৪ ও ৫ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও।

আপনা প্রচার হেতু সৃজিল জীবন।
নিজ ভয় দর্শাইতে সৃজিল মরণ।।
কাকে কৈল ভিক্ষুক কাকে কৈল ধনী।
কাকে কৈল নিগুণী কাকে কৈল গুণী।।

৩. উদ্ধৃত অংশটি একটি-
ক. মহাকাব্যের অংশ বিশেষ   খ. চতুর্দশপদী কবিতার অংশ বিশেষ
গ. কাহিনী কবিতার অংশ বিশেষ   ঘ. গীতি কবিতার অংশ বিশেষ

৪. উদ্ধৃতাংশে প্রকাশ পেয়েছে-
ক. সৃষ্টির উদ্দেশ্য   খ. সৃষ্টির নৈপুণ্য
গ. সৃষ্টির রহস্য   ঘ. সৃষ্টির লক্ষ্য

৫. 'আপনা প্রচার হেতু সৃজিল জীবন।'–এ কথার অর্থ হলো–
   i. সৃষ্টির মাঝে স্রষ্টার প্রকাশ
   ii. সৃষ্টিতে স্রষ্টার গৌরব
   iii. প্রচার ও প্রকাশের লক্ষ্যে মানব সৃষ্টি

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i   খ. i ও ii
গ. iii   ঘ. i ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

"আগুন, পানি, মাটি, বাতাস প্রভৃতি উপাদান সহযোগে মহান কারিগর এই বিশাল বিশ্বকে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তাতে পাহাড়, পর্বত, সাগর, নদী স্থাপন করেছেন, ছড়িয়ে দিয়েছেন বিচিত্র জলচর প্রাণীসহ কীটপতঙ্গ, বৃক্ষলতা, পশুপাখি। আকাশকে শোভিত করেছেন চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ-নক্ষত্র দ্বারা। সকল প্রশংসা তাঁরই। তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি হিসেবে। শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি এই মানুষকে তিনি ভাগ্যের অধীন করে রেখেছেন।"

উদ্ধৃত অংশটি পড়ে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

ক. কাকে 'মহান কারিগর' বলে সম্বোধন করা হয়েছে ?
খ. 'মহান কারিগর' বিশেষণটি ব্যবহারের কারণ বর্ণনা কর।
গ. উদ্দীপকের আলোকে 'সকল প্রশংসা তাঁরই'- মন্তব্যের যৌক্তিক ব্যাখ্যা দাও।
ঘ. "শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি এই মানুষকে তিনি ভাগ্যের অধীন করে রেখেছেন।"- উক্তিটি বিশ্লেষণ কর।

বঙ্গবাণী

আবদুল হাকিম

[**কবি-পরিচিতি :** আনুমানিক ১৬২০ খ্রিষ্টাব্দে সন্দীপের সুধারামপুর গ্রামে আবদুল হাকিম জন্মগ্রহণ করেন। মধ্যযুগের অন্যতম প্রধান কবি আবদুল হাকিমের স্বদেশের ও স্বভাষার প্রতি ছিল অটুট ও অপরিসীম প্রেম। সেই যুগে মাতৃভাষার প্রতি এমন গভীর ভালোবাসার নিদর্শন ইতিহাসে এক বিরল দৃষ্টান্ত এবং পরবর্তী প্রজন্মের জন্য কালজয়ী আদর্শ। *নূরনামা* তাঁর বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ। তাঁর অন্যান্য উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ হল **:** *ইউসুফ জোলেখা, লালমতি, সয়ফুলমুলুক, শিহাবুদ্দিননামা, নসীহৎনামা, কারবালা* ও *শহরনামা*। তাঁর কবিতায় তাঁর অনুপম ব্যক্তিত্বের পরিচয় মেলে। তিনি ১৬৯০ সালে মৃত্যুবরণ করেন।]

কিতাব পড়িতে যার নাহিক অভ্যাস।
সে সবে কহিল মোতে মনে হাবিলাষ ॥
তে কাজে নিবেদি বাংলা করিয়া রচন।
নিজ পরিশ্রম তোষি আমি সর্বজন ॥

আরবি ফারসি শাস্ত্রে নাই কোন রাগ।
দেশী ভাষে বুঝিতে ললাটে পুরে ভাগ ॥
আরবি ফারসি হিন্দে নাই দুই মত।

যদি বা লিখয়ে আল্লা নবীর ছিফত ॥
যেই দেশে যেই বাক্য কহে নরগণ।
সেই বাক্য বুঝে প্রভু আপে নিরঞ্জন ॥
সর্ববাক্য বুঝে প্রভু কিবা হিন্দুয়ানী।
বঙ্গদেশী বাক্য কিবা যত ইতি বাণী ॥
মারফত ভেদে যার নাহিক গমন।
হিন্দুর অক্ষর হিংসে সে সবের গণ ॥
যে সবে বঙ্গেত জন্মি হিংসে বঙ্গবাণী।
সে সব কাহার জন্ম নির্ণয় ন জানি ॥
দেশী ভাষা বিদ্যা যার মনে ন জুয়ায়।
নিজ দেশ তেয়াগী কেন বিদেশ ন যায় ॥
মাতা পিতামহ ক্রমে বঙ্গেত বসতি।
দেশী ভাষা উপদেশ মনে হিত অতি ॥

অনুশীলনমূলক কাজ

উৎস

'বঙ্গবাণী' কবিতাটি কবি আবদুল হাকিমের *নূরনামা* কাব্যগ্রন্থ থেকে সংকলন করা হয়েছে। মধ্যযুগীয় পরিবেশে বঙ্গভাষী এবং বঙ্গভাষার প্রতি এমন বলিষ্ঠ বাণীবন্ধ কবিতার নিদর্শন দুর্লভ।

মূলবক্তব্য

কবি এই কবিতায় তাঁর গভীর উপলব্ধি ও বিশ্বাসের কথা নির্দ্বিধায় ব্যক্ত করেছেন। আরবি ফারসি ভাষার প্রতি কবির মোটেই বিদ্বেষ নেই। এসব ভাষায় আল্লাহ ও মহানবীর স্তুতি বর্ণিত হয়েছে। তাই এসব ভাষার প্রতি সবাই পরম শ্রদ্ধাশীল। যে ভাষা জনসাধারণের বোধগম্য নয়, যে ভাষায় অন্যের সঙ্গে ভাববিনিময় করা যায় না, সেসব ভাষাভাষী লোকের পক্ষে মাতৃভাষায় কথা বলা বা লেখাই একমাত্র পন্থা। এ কারণেই কবি মাতৃভাষায় গ্রন্থ রচনায় মনোনিবেশ করেছেন। কবির মতে, মানুষ মাত্রেই নিজ ভাষায় স্রষ্টাকে ডাকে আর স্রষ্টাও মানুষের বক্তব্য বুঝতে পারেন। কবির চিত্তে তীব্র ক্ষোভ এজন্য যে, যারা বাংলাদেশে জন্মগ্রহণ করেছে, অথচ বাংলা ভাষার প্রতি তাদের মমতা নেই, তাদের বংশ ও জন্মপরিচয় সম্পর্কে কবির মনে সন্দেহ জাগে। কবি সখেদে বলেছেন, যাদের মনে স্বদেশের ও স্বভাষার প্রতি কিছুমাত্র অনুরাগ নেই তারা কেন এদেশ পরিত্যাগ করে অন্যত্র চলে যায় না ! বংশানুক্রমে বাংলাদেশেই আমাদের বসতি, বাংলাদেশ আমাদের মাতৃভূমি এবং মাতৃভাষায় বর্ণিত বক্তব্য আমাদের মর্ম স্পর্শ করে। এই ভাষার চেয়ে হিতকর আর কী হতে পারে !

শব্দার্থ ও টীকা

হাবিলাষ – অভিলাষ, প্রবল ইচ্ছা। **ছিফত** – গুণ। **নিরঞ্জন** – নির্মল (এখানে সৃষ্টিকর্তা, আল্লাহ)। **বঙ্গবাণী** – বাংলা ভাষা। **মারফত** – মরমী সাধনা, আল্লাহকে সম্যকভাবে জানার জন্য সাধনা। **জুয়ায়** – যোগায়। **ভাগ** – ভাগ্য। **দেশী ভাষা বিদ্যা যার মনে ন জুয়ায়** – এই কবিতাটি সপ্তদশ শতকে রচিত। তৎকালেও একশ্রেণীর লোক নিজের দেশ, নিজের ভাষা, নিজের সংস্কৃতি, এমনকি নিজের আসল পরিচয় সম্পর্কেও ছিল বিভ্রান্ত এবং সংকীর্ণচেতা। শিকড়হীন পরগাছা স্বভাবের এসব লোকের প্রতি কবি তীব্র ক্ষোভে বলিষ্ঠ বাণী উচ্চারণ করে বলেছেন, 'নিজ দেশ তেয়াগী কেন বিদেশ ন যায়'। **আপে** – স্বয়ং, আপনি।

অনুশীলনী

ক. বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

নিচের অংশটুকু পড় এবং ১, ২ ও ৩ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

বাংলাদেশ আমাদের মাতৃভূমি। বাংলা ভাষা আমাদের মাতৃভাষা। বংশপরম্পরায় আমরা আমাদের মাতৃভাষাকে অন্তরে লালন করছি। স্বদেশ এবং স্বভাষার প্রতি মমতা প্রদর্শনের মধ্যেই অন্তর্নিহিত আছে আমাদের জাতীয় পরিচয়। যারা বাংলাদেশে জন্মগ্রহণ করেও বাংলা ভাষার প্রতি অনুদার তাদের বংশ-পরিচয় সন্দেহজনক।

১। উল্লিখিত অংশটুকু তোমার পাঠ্যসূচির কোন কবিতার সঙ্গে সম্পর্কিত-

ক. বঙ্গবাণী　　খ. কপোতাক্ষ নদ

গ. শহীদ স্মরণে　　ঘ. স্বাধীনতা তুমি

২. বাংলা ভাষার প্রতি অনুদার ব্যক্তিদের বংশ পরিচয় সম্পর্কে মতামত দিয়ে কবি–

i. বিস্ময় প্রকাশ করেছেন

ii. ভর্ৎসনা করেছেন

iii. ধিক্কার দিয়েছেন

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i ও ii　　খ. i ও iii

গ. ii ও iii　　ঘ. iii

৩. কবি আবদুল হাকিমের মাতৃভাষা-প্রীতির ধারাবাহিকতায় বাঙালির বর্তমান প্রাপ্তি কোনটি ?

ক. স্বাধীন দেশের অস্তিত্ব　　খ. বায়ান্নর ভাষা-আন্দোলন

গ. আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস　　ঘ. অগণিত সাহিত্যসম্ভার

৪. 'যেই দেশে যেই বাক্য কহে নরগণ'– এখানে 'যেই বাক্য' বলতে কবি বুঝিয়েছেন–

ক. বাংলা ভাষাকে　　খ. মাতৃভাষাকে

গ. সকল ভাষাকে　　ঘ. যে কোনো ভাষাকে

খ. সৃজনশীল প্রশ্ন

১. নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

প্রখ্যাত কবি আবদুল হাকিমের 'বঙ্গবাণী' কবিতায় সপ্তদশ শতকের ভাষা ও সংস্কৃতির বেশকিছু চিত্র ফুটে উঠেছে। এর মধ্যে নিজের দেশ, ভাষা ও সংস্কৃতির প্রতি একশ্রেণীর সংস্কারাচ্ছন্ন ও উন্নাসিক লোকের অবজ্ঞার পরিচয় পাওয়া যায়। যারা অন্য ভাষা ও সংস্কৃতির কাছে নিজ ভাষা ও সংস্কৃতিকে বিসর্জন দেয় তাদের প্রতি কবি তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। মধ্যযুগে এমন বলিষ্ঠ বাণীবন্ধ কবিতার নিদর্শন দুর্লভ।

ক. 'বঙ্গবাণী' কবিতাটি কবির কোন কাব্যগ্রন্থ থেকে নেওয়া হয়েছে?

খ. 'উন্নাসিক লোক' বলতে অনুচ্ছেদে কী বোঝানো হয়েছে? ব্যাখ্যা কর।

গ. অনুচ্ছেদে কবির ক্ষোভ প্রকাশের যে কারণ পাওয়া যায় তার সঙ্গে বর্তমান সময়ের তুলনা কর।

ঘ. "মধ্যযুগে এমন বলিষ্ঠ বাণীবন্ধ কবিতার নিদর্শন দুর্লভ"–উক্তিটি 'বঙ্গবাণী' কবিতার আলোকে বিশ্লেষণ কর।

মানুষ কে?

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত

[**কবি-পরিচিতি :** ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ১৮১২ খ্রিষ্টাব্দে কলকাতার কাছাকাছি কাঁচড়াপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। দারিদ্র্যের জন্য তিনি বেশি লেখাপড়া করতে না পারলেও আপন সাধনা ও প্রতিভাবলে কবিতায় নতুন দিক প্রবর্তন করেন। তাঁকে যুগসন্ধিকালের কবি বলা হয়। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক ছিলেন। তাঁর কবিতায় অনুপ্রাস ও অলঙ্কারপ্রিয়তা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। তিনি রঙ্গ ও ব্যঙ্গ কবিতা রচনায় দক্ষ ছিলেন। তাঁর দেশপ্রেম এবং নীতিমূলক কবিতাগুলো জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। *হিত প্রভাকর* ও *বোধেন্দু বিকাশ* তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। ১৮৫৯ খ্রিষ্টাব্দে তিনি পরলোকগমন করেন।]

নিয়ত মানসধামে একরূপ ভাব।
জগতের সুখ-দুখে সুখ দুখ লাভ ॥
পরপীড়া পরিহার, পূর্ণ পরিতোষ।
সদানন্দে পরিপূর্ণ স্বভাবের কোষ ॥
নাহি চায় আপনার পরিবার সুখ।
রাজ্যের কুশলকার্যে সদা হাস্যমুখ ॥
কেবল পরের হিতে প্রেম লাভ যার।
মানুষ তারেই বলি মানুষ কে আর ?

নাহি চায় রাজ্যপদ নাহি চায় ধন।
স্বর্গের সমান দেখে বন উপবন ॥
পৃথিবীর সমুদয় নিজ পরিজন।
সন্তোষের সিংহাসনে বাস করে মন ॥
আত্মার সহিত সব সমতুল্য গণে।
মাতাপিতা জ্ঞাতি ভাই ভেদ নাহি মনে ॥
সকলে সমান মিত্র শত্রু নাহি যার।
মানুষ তারেই বলি মানুষ কে আর ?

অহংকার-মদে কভু নহে অভিমানী।
সর্বদা রসনারাজ্যে বাস করে বাণী ॥
ভুবন ভূষিত সদা বক্তৃতার বশে।
পর্বত সলিল হয় রসনার রসে ॥
মিথ্যার কাননে কভু ভ্রমে নাহি ভ্রমে।
অঙ্গীকার অস্বীকার নাহি কোন ক্রমে ॥
অমৃত নিঃসৃত হয় প্রতি বাক্যে যার।
মানুষ তারেই বলি মানুষ কে আর ?

চেষ্টা যত্ন অনুরাগ মনের বান্ধব।
আলস্য তাদের কাছে রণে পরাভব ॥
ভক্তিমতে কুশলগণে আয় আয় ডাকে।
পরিশ্রম প্রতিজ্ঞার সঙ্গে সঙ্গে থাকে।
চেষ্টায় সুসিদ্ধ করে জীবনের আশা।
যতনে হৃদয়েতে সমুদয় বাসা ॥
স্মরণ স্মরণ মাত্রে আজ্ঞাকারী যার।
মানুষ তারেই বলি মানুষ কে আর ?

অনুশীলনমূলক কাজ

উৎস

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের 'মানুষ কে?' কবিতাটি তাঁর *কবিতা সংগ্রহ* নামক গ্রন্থ থেকে গৃহীত হয়েছে।

মূলবক্তব্য

'মানুষ কে?' কবিতায় কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত প্রকৃত মনুষ্যত্বের বিশিষ্ট দিকগুলো বর্ণনা করেছেন। আদর্শ মানুষের স্বরূপ কী হওয়া সমীচীন, এ প্রসঙ্গে কবি বলেছেন যে প্রকৃত মানুষ জীবনে সুখ ও দুঃখকে সমানভাবেই গ্রহণ করেন। আত্মসুখকে তাঁরা কখনই বড় করে দেখেন না। তাঁরা নিজের স্বার্থ তুচ্ছ করে দেশের এবং দেশের মানুষের কল্যাণের জন্য চিন্তায় ও কর্মে আপনাকে নিয়োজিত রাখেন। পার্থিব সুখ বা ধনসম্পদের প্রতি তাঁরা লালায়িত নন। তাঁরা স্বল্পতুষ্ট ব্যক্তি। উচ্চ-নীচ ভেদে তাঁরা পৃথিবীর সব মানুষকে আপনজন বলে মনে করেন। প্রকৃত মানুষ অহংকার কাকে বলে জানেন না। তাঁরা বিনয়ী, সুন্দর কথা দিয়ে তাঁরা মানুষের অন্তর সহজেই জয় করতে পারেন। তাঁরা সত্যভাষী। যা তাঁরা মুখে বলেন, তা কাজে পরিণত করেন। যিনি প্রকৃত মানুষ তিনি কেবল প্রতিভার ওপর নির্ভরশীল নন। পরিশ্রম তাঁদের স্বভাবের অপরিহার্য অঙ্গ শুধু নয়, অঙ্গের ভূষণও।

শব্দার্থ ও টীকা

পরিহার – পরিহার করে বা ত্যাগ করে। **পরিতোষ** – সন্তোষ। **উপবন** – উদ্যান। **সমুদয়** – সকল। **সমতুল্য** – সমান সমান, সমকক্ষ। **রসনা** – জিহ্বা। **অঙ্গীকার** – প্রতিশ্রুতি। **অমৃত** – সুধা। **নিঃসৃত** – নির্গত। **পরাভব** – পরাজয়। **কুশলগণে** – মঙ্গলকে। **সুসিদ্ধ** – সুন্দরভাবে সফল বা নিষ্পন্ন। **কোষ** – ভাড়ার (এখানে স্বভাবের কোষ– বলতে স্বভাবের বৈশিষ্ট্যকে বোঝানো হয়েছে।)

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. ঈশ্বর চন্দ্র গুপ্তের কাব্যগ্রন্থ কোনটি ?

ক. লালমতি   খ. পদ্মাবতী
গ. হিতপ্রভাকর   ঘ. বীরাঙ্গনা

২. ‘প্রকৃত মানুষ, মানুষের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ করেন না’ কোন পঙ্‌ক্তির মাধ্যমে এই বিশেষ অর্থ প্রকাশ পেয়েছে ?
   ক. পরপীড়া পরিহার, পূর্ণ পরিতোষ
   খ. স্বর্গের সমান দেখে বন উপবন
   গ. রাজ্যের কুশল কার্যে সদা হাস্যমুখ
   ঘ. চেষ্টা যত্ন অনুরাগ মনের বান্ধব

৩. মিথ্যার কাননে কবু ভ্রমে নাহি ভ্রমে;-পংক্তিটির অর্থ-
   ক. তাঁরা সত্যবাদী
   খ. তাঁরা বিনয়ী
   গ. তাঁরা আপোষহীন
   ঘ. তাঁরা পরিশ্রমী

৪. ‘মানুষকে’ কবিতায় কবি কোন বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়েছেন ?
   ক. মানুষের সম অধিকার
   খ. প্রকৃতমানুষ্যত্ব
   গ. মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব
   ঘ. সত্যের জয়

সৃজনশীল প্রশ্ন

পরপীড়া পরিহার, পূর্ণ পরিতোষ।
সদানন্দে পরিপূর্ণ স্বভাবের কোষ।।
নাহি চায় আপনার পরিবার সুখ।
রাজ্যের কুমলকার্যে সদা হাস্যমুখ।।
কেবল পরের হিতে প্রেম লাভ যার।
মানুষ তারেই বলি মানুষ কে তার?

ক. ‘পরিতোষ’ শব্দের পরিভাষা কী ?
খ. ‘কেবল পরের হিতে প্রেম লাভ’ চরণটির অর্থ ব্যাখ্যা কর।
গ. উদ্দীপকের বৈশিষ্ট্যগুলোর সমন্বয়ে কীভাবে একজন মানুষ সমাজে আদর্শ প্রতিষ্ঠা করতে পারে প্রমাণ কর।
ঘ. প্রকৃত মানুষকে উদ্দীপকের আলোকে বিশ্লেষণ কর।

কপোতাক্ষ নদ

মাইকেল মধুসূদন দত্ত

[**কবি-পরিচিতি :** মধুসূদন দত্ত ১৮২৪ খ্রিস্টাব্দের ২৫শে জানুয়ারি যশোর জেলার সাগরদাঁড়ি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। স্কুলজীবনের শেষে তিনি কলকাতার হিন্দু কলেজে ভর্তি হন। এই কলেজে অধ্যয়নকালে ইংরেজি সাহিত্যের প্রতি তাঁর তীব্র অনুরাগ জন্মে। ১৮৪৩ খ্রিস্টাব্দে তিনি খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত হন। তখন তাঁর নামের প্রথমে যোগ হয় 'মাইকেল'। পাশ্চাত্য জীবন যাপনের প্রতি প্রবল ইচ্ছা এবং ইংরেজি ভাষায় সাহিত্যসাধনায় তীব্র আবেগ তাঁকে ইংরেজি ভাষায় সাহিত্যরচনায় উদ্বুদ্ধ করে। পরবর্তীকালে জীবনের বিচিত্র কষ্টকর অভিজ্ঞতায় তাঁর এই ভুল ভেঙেছিল। বাংলা ভাষায় কাব্যরচনার মধ্য দিয়ে তাঁর কবিপ্রতিভার যথার্থ স্ফূর্তি ঘটে। তাঁর অমর কীর্তি *মেঘনাদবধ কাব্য*। তাঁর অন্যান্য কাব্যগ্রন্থ : *তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য, বীরাঙ্গানা কাব্য, ব্রজাঙ্গানা কাব্য* ও *চতুর্দশপদী কবিতাবলি*। তাঁর নাটক : *কৃষ্ণকুমারী, শর্মিষ্ঠা, পদ্মাবতী;* এবং প্রহসন : *একেই কি বলে সভ্যতা* ও *বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ*। বাংলা কাব্যে অমিত্রাক্ষর ছন্দ এবং সনেট প্রবর্তন করে তিনি বাংলা সাহিত্যে যোগ করেছেন নতুন মাত্রা। ১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দের ২৯ শে জুন কবি পরলোকগমন করেন।]

সতত, হে নদ, তুমি পড় মোর মনে !
সতত তোমার কথা ভাবি এ বিরলে;
সতত (যেমতি লোক নিশার স্বপনে
শোনে মায়া-মন্ত্রধ্বনি) তব কলকলে
জুড়াই এ কান আমি ভ্রান্তির ছলনে !
বহু দেশে দেখিয়াছি বহু নদ-দলে,
কিন্তু এ স্নেহের তৃষ্ণা মিটে কার জলে ?
দুগ্ধ- স্রোতোরূপী তুমি জন্মভূমি-স্তনে।

আর কি হে হবে দেখা? –যত দিন যাবে,
প্রজারূপে রাজরূপ সাগরেরে দিতে
বারি-রূপ কর তুমি; এ মিনতি, গাবে
বঙ্গজ জনের কানে, সখে, সখা-রীতে
নাম তার, এ প্রবাসে মজি প্রেম-ভাবে
লইছে যে তব নাম বঙ্গের সংগীতে।

অনুশীলনমূলক কাজ

উৎস

'কপোতাক্ষ নদ' কবিতাটি কবির *চতুর্দশপদী কবিতাবলি* থেকে গৃহীত হয়েছে। এই কবিতায় কবির স্মৃতিকাতরতার আবরণে তাঁর অত্যুজ্জ্বল দেশপ্রেম প্রকাশিত হয়েছে।

মূলবক্তব্য

যশোর জেলার কপোতাক্ষ নদের তীরে সাগরদাঁড়ি গ্রামে মধুসূদনের জন্ম। শৈশবে মধুসূদন এই নদের তীরে প্রাকৃতিক পরিবেশে বড় হয়েছেন। যখন তিনি ফ্রান্সে বসবাস করেন, তখন জন্মভূমির শৈশব-কৈশোরের বেদনা-বিধুর স্মৃতি তাঁর মনে জাগিয়েছে কাতরতা। দূরে বসেও তিনি যেন কপোতাক্ষ নদের কলকল ধ্বনি শুনতে পান। কত দেশে কত নদ-নদী তিনি দেখেছেন, কিন্তু জন্মভূমির এই নদ যেন মায়ের স্নেহডোরে তাঁকে বেঁধেছে, কিছুতেই তিনি তাকে ভুলতে পারেন না। কবির মনে সন্দেহ জাগে, আর কি তিনি এই নদের দেখা পাবেন ! নদের কাছে তাঁর সবিনয় মিনতি – বন্ধুভাবে তাকে তিনি স্নেহাদরে যেমন স্মরণ করেন, কপোতাক্ষও যেন একই প্রেমভাবে তাঁকে সস্নেহে স্মরণ করে। কপোতাক্ষ নদ যেন তার স্বদেশের জন্য হৃদয়ের কাতরতা বঙ্গবাসীদের নিকট ব্যক্ত করে – যিনি প্রবাসজীবনেও গানে, কবিতায় শৈশব-কৈশোরের স্মৃতিবিজড়িত নদীর কথা লিখেছেন।

শব্দার্থ ও টীকা

সতত – সর্বদা। **বিরলে** –একান্ত নিরিবিলিতে। **নিশা** – রাত্রি। **ভ্রান্তি** – ভুল। **বারি-রূপকর** – প্রজা যেমন রাজাকে কর বা রাজস্ব দেয়, তেমনি কপোতাক্ষ নদও সাগরকে জলরূপ কর বা রাজস্ব দিচেছ।

চতুর্দশপদী কবিতা – ইংরেজিতে Sonnet, বাংলায় চতুর্দশপদী কবিতা। চৌদ্দ-চরণ-সমন্বিত ভাবসংহত বিশেষ ধরনের এই বাংলা কবিতার প্রবর্তক মাইকেল মধুসূদন দত্ত। সনেটের গঠন-প্রকৃতি ও চরণের মিল সুনির্দিষ্ট। চতুর্দশপদী কবিতার প্রথম আট চরণের স্তবককে অষ্টক (Octave) এবং পরবর্তী ছয় চরণের স্তবককে ষষ্টক (sestet) বলে। অষ্টকে মূলত ভাবের প্রবর্তনা এবং ষষ্টকে ভাবের পরিণতি থাকে। চতুর্দশপদী কবিতায় কয়েক প্রকার অন্ত্যমিল প্রচলিত আছে। যেমন, প্রথম আট চরণ : কখখক কখখক। শেষ ছয় চরণ : ঘঙচ ঘঙচ। অথবা প্রথম আট চরণ : কখখগ কখখগ, শেষ ছয় চরণ : ঘঙঘঙ চচ। 'কপোতাক্ষ নদ' একটি চতুর্দশপদী কবিতা। এখানে মিলবিন্যাস : কখকখকখখক গঘগঘগঘ।

অনুশীলনী

ক. বহু নির্বাচনি প্রশ্ন

১. কবির কাছে ভ্রান্তির ছলনা কোনটি ?

ক. নিশার স্বপন
খ. মায়া-মন্ত্রধ্বনি
গ. স্নেহের তৃষ্ণা
ঘ. কপোতাক্ষের কলকল

২. 'কপোতাক্ষ নদ' কবিতায় যে সম্বোধনসূচক শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, তা –

i. সখা
ii. সখে
iii. হে নদ

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i　　খ. i ও ii
গ. i ও ii　　ঘ. ii ও iii

নিচের অংশটুকু পড় এবং ৩, ৪ ও ৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

সনেটের গঠন-প্রকৃতি ও চরণের মিল সুনির্দিষ্ট। প্রথম আট চরণকে অষ্টক এবং পরবর্তী ছয় চরণকে ষষ্টক বলা হয়। অষ্টকে ভাবের প্রবর্তনা এবং ষষ্টকে ভাবের পরিণতি সনেটের বৈশিষ্ট্য।

৩. ‘কপোতাক্ষ নদ’ কবিতার চতুর্থ পঙ্‌ক্তিতে উচচারিত ‘এ বিরলে’ শব্দের সঙ্গে অন্ত্যমিল রক্ষাকারী শব্দ কোনটি ?

ক. তব কলকলে　　খ. কার জলে
গ. স্বপনে　　ঘ. ছলনে

৪. ‘কপোতাক্ষ নদ’ কবিতায় ভাবের প্রবর্তনামূলক অষ্টকের মূল বক্তব্য কোনটি ?

ক. ভ্রান্ত আবেগ　　খ. নদীর প্রতি মমতা
গ. দেশপ্রেম　　ঘ. স্মৃতিকাতরতা

৫. বাংলায় চতুর্দশপদী কবিতার প্রথম রচয়িতা কে?

ক. আবদুল হাকিম　　খ. মধুসূদন দত্ত
গ. কায়কোবাদ　　ঘ. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

খ. সৃজনশীল প্রশ্ন

১. ছকটি লক্ষ কর এবং নিচের প্রশ্নমালার উত্তর দাও।
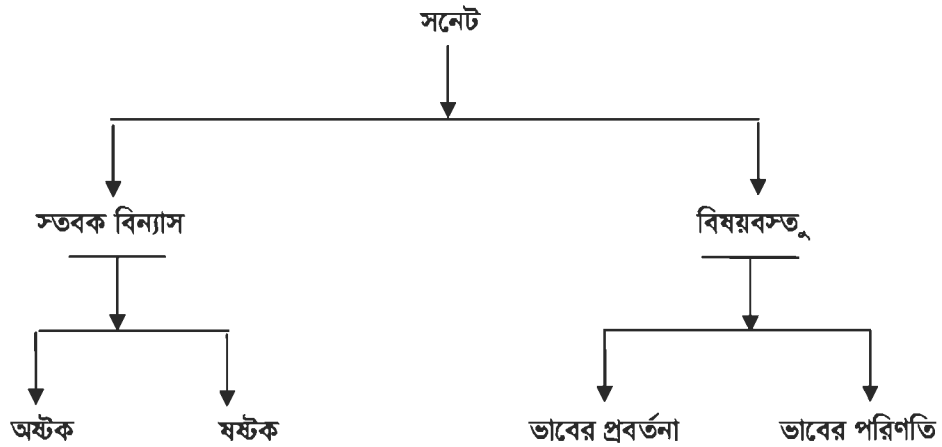
ক. সনেট কী ?
খ. ছকের আলোকে সনেটের বৈশিষ্ট্য উল্লেখ কর।
গ. উদ্দীপকে সনেট-এর যে গড়ন উল্লিখিত হয়েছে ‘কপোতাক্ষ নদ’ কবিতার ক্ষেত্রে এর কার্যকারিতা তুলে ধর।
ঘ. সনেট-এর এই গড়নসৌষ্ঠব বিষয়-উপস্থাপনে কতটুকু যথার্থ–বিচার-বিশ্লেষণ কর।

বাংলা আমার

কায়কোবাদ

[**কবি-পরিচিতি:** কবি কায়কোবাদ ১৮৫৭ খ্রিষ্টাব্দে ঢাকা জেলার নবাবগঞ্জ থানার আগলা পূর্বপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর প্রকৃত নাম কাজেম আল কোরায়শী। এনট্রান্স পরীক্ষার পূর্বেই তাঁর শিক্ষাজীবনের সমাপ্তি ঘটে। সরকারের ডাক বিভাগে দীর্ঘকাল চাকরির পর ১৯১৯ সালে তিনি অবসর গ্রহণ করেন। তাঁর কাব্যে প্রকৃতিপ্রেম ও ঐতিহ্যপ্রীতি লক্ষণীয়। তিনি *মহাশ্মশান* কাব্য রচনা করে মহাকবির মর্যাদা লাভ করেন। প্রকৃতপক্ষে তিনি ছিলেন গীতিকবি। *অশ্রুমালা, অমিয় ধারা* তাঁর উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ। *মহাশ্মশান* তাঁর রচিত মহাকাব্য। কবি কায়কোবাদ ১৯৫১ সালের ২১শে জুলাই পরলোকগমন করেন।]

বাংলা আমার আমি বাংলার
বাংলা আমার জন্মভূমি
গঙ্গা ও যমুনা পদ্মা ও মেঘনা
বহিছে যাহার চরণ চুমি!

বাংলার হাওয়া বাংলার জল
হৃদয় আমার করে সুশীতল
এত সুখ-শান্তি এত পরিমল
কোথা পাব আর বাংলা ছাড়া।

হৃদয় আমার বাংলার লাগি
যে দেশেই থাকি সদা থাকে জাগি
স্বর্গ হতেও শ্রেষ্ঠ সে আমার
বাংলা আমার অমিয়-ধারা।

বাংলার তরু বাংলার ফল
বাংলার পুষ্প বাংলার কমল
মাঠে ঘাটে পথে তটিনী সৈকতে
যে দেখে সে আপন হারা।

বাংলার নদী কি শোভাশালিনী
কি মধুর তার কুল কুলু ধ্বনি
দু ধারে তাহার বিটপীর শ্রেণী
হেরিলে জুড়ায় হিয়া।

বাংলার কুলি বাংলার চাষি,
বাংলার মাটি কত ভালোবাসি
প্রাণের আবেগে যাই সদা ছুটি
যেখানে বাঙ্গালি আছে।

বাংলার গল্প বাংলার গীত
শুনিলে এ চিত্ত সদা বিমোহিত
সুখ দুঃখ সব নিরালা বসিয়া
বলি বাঙালির কাছে।

বাংলার কাব্য বাংলার ভাষা
মিটায় আমার প্রাণের পিপাসা
সে দেশ আমার নয় গো আপন
যে দেশে বাঙালি নাই।

বাঙালির সনে মিশে প্রাণে প্রাণে
থাকিব সতত জীবনে মরণে
বাঙালি আমার আপনার জন
বাঙালি আমার ভাই !

সুখে দুঃখে তারা এসে মোর পাশে
তোষে সদা মোরে মধুর সম্ভাষে
আমিও বাঙালি তারাও বাঙালি
বাংলা আমার জন্মভূমি !

গোধূলি লগনে জগদীশে স্মরে
বিদায় লইব জনমের তরে
লুকাইব আমি সন্ধ্যার আঁধারে
বাংলা মায়ের ক্রোড়ে।

অনুশীলনমূলক কাজ

উৎস

'বাংলা আমার' কবিতাটি কবির *অমিয় ধারা* কাব্যগ্রন্থ থেকে সংকলিত। জন্মভূমি বাংলাদেশের প্রতি কবির গভীর মমত্ববোধ এ কবিতায় উৎসারিত।

মূলবক্তব্য

বাংলাদেশ আমাদের প্রিয় জন্মভূমি। গঙ্গা, যমুনা, পদ্মা ও মেঘনার জলধারাবিধৌত এ দেশ। এ দেশের তরুলতা ফুলফল এবং সবার ওপরে এ দেশের মানুষ আমাদের একান্ত আপনজন। সুখে-দুঃখে, আনন্দে-বেদনায় আমরা পরস্পর মিলেমিশে থাকি। বাংলার কাব্য, গল্প, গীত আমাদের চিত্তকে বিমোহিত করে। স্বর্গ থেকেও শ্রেষ্ঠ আমাদের এ দেশ– বাংলাদেশ।

শব্দার্থ ও টীকা

পরিমল – সুগন্ধ, সুবাস। **অমিয়** – সুধা, অমৃত। **তটিনী** – নদী। **বিটপী** – বৃক্ষ, গাছগাছালি। **বিমোহিত** – বিমুগ্ধ, আনন্দে অভিভূত। **জগদীশে** – সৃষ্টিকর্তাকে।

অনুশীলনী

ক. বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. কোন কবিতায় একই সঙ্গে প্রকৃতিপ্রীতি ও স্বদেশপ্রীতির পরিচয় পাওয়া যায় ?

ক. বঙ্গবাণী খ. কপোতাক্ষ নদ

গ. বাংলা আমার ঘ. পল্লীবর্ষা

২. কোন পঙ্‌ক্তিতে কবির স্বদেশপ্রীতির পরিচয় ফুটে উঠেছে ?

ক. আমিও বাঙালি তারাও বাঙালি

খ. কোথা পাব আর বাংলা ছাড়া

গ. যে দেখে সে আপনহারা

ঘ. বাংলা আমার অমিয় ধারা

৩. 'লুকাইব আমি সন্ধ্যার আঁধারে' বলতে কবি কী বুঝিয়েছেন ?

ক. অন্তিম ইচ্ছা খ. অন্তিম শয্যা

গ. দিগন্তের আলো ঘ. প্রকৃতির সান্নিধ্য

খ. সৃজনশীল প্রশ্ন

১. নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

বাংলাদেশ কবির জন্মভূমি। গঙ্গা, যমুনা, পদ্মা, মেঘনাসহ অসংখ্য নদীর জলধারাবিধৌত এদেশ। এ দেশের বৃক্ষরাজি, ফলমূল তথা প্রাকৃতিক সৌন্দর্য যেমন কবির প্রিয়, তেমনি এ দেশের মানুষও কবির একান্ত আপনজন। সুখ-দুঃখে, আনন্দ-বেদনায় কবি তাদের সঙ্গে মিলেমিশে থাকতে চান। কবির চিত্তকে বাংলার গল্প, গীত বিমোহিত করে। তাই কবির কাছে বাংলাদেশ স্বর্গের চেয়েও শ্রেষ্ঠ।

ক. কবি কায়কোবাদের প্রকৃত নাম কী?

খ. অনুচ্ছেদের আলোকে কবির দেশপ্রীতির পরিচয় দাও।

গ. অনুচ্ছেদের বিষয়বস্তুর সঙ্গে তোমার পঠিত অন্য একটি কবিতার বিষয়বস্তুর সাদৃশ্য তুলে ধর।

ঘ. 'কবির কাছে বাংলাদেশ স্বর্গের চেয়েও শ্রেষ্ঠ' —উক্তিটি তোমার পঠিত কবিতার আলোকে বিশ্লেষণ কর।

সবুজের অভিযান

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[**কবি-পরিচিতি** : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৮৬১ খ্রিস্টাব্দের ৭ই মে (২৫শে বৈশাখ, ১২৬৮ বঙ্গাব্দ) কলকাতার জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকালে রবীন্দ্রনাথকে ওরিয়েন্টাল সেমিনারি, নর্মাল স্কুল, বেঙ্গল একাডেমী প্রভৃতি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে লেখাপড়ার জন্য পাঠানো হলেও তিনি বেশিদিন স্কুলের শাসনে থাকতে পারেননি। সতেরো বছর বয়সে তাঁকে পাঠানো হয় ব্যারিস্টারি পড়ার জন্য। কিন্তু দেড় বছর পর তিনি ব্যারিস্টারি পড়া অসম্পূর্ণ রেখে দেশে ফিরে আসেন। ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দে রবীন্দ্রনাথ *গীতাঞ্জলি* কাব্যের জন্য এশীয়দের মধ্যে প্রথম সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। রবীন্দ্রনাথের একক সাধনায় বাংলা ভাষা সকল শাখায় সমৃদ্ধ হয়ে বিশ্ব-দরবারে সগৌরবে প্রতিষ্ঠিত হয়। কাব্য, ছোটগল্প, উপন্যাস, ভ্রমণকাহিনী, নাটক, প্রবন্ধ, গান – সাহিত্যের প্রত্যেক বিভাগেই তাঁর অবদান রয়েছে। তিনি একাধারে সাহিত্যিক, দার্শনিক, শিক্ষাবিদ, সুরকার, চিত্রকর, নাট্যকার, নাট্যপ্রযোজক এবং অভিনেতা ছিলেন। তাঁর অজস্র রচনার মধ্যে *সোনার তরী, চিত্রা, বলাকা, ক্ষণিকা, ঘরে বাইরে, গোরা, শেষের কবিতা, বিসর্জন, রক্তকরবী ও গল্পগুচ্ছ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কলকাতা,* ঢাকা, অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিশ্বের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি সম্মানসূচক ডি.লিট. ডিগ্রি লাভ করেন। রবীন্দ্রনাথ ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দের ৭ই আগস্ট (২২শে শ্রাবণ, ১৩৪৮ বঙ্গাব্দ) কলকাতায় পরলোকগমন করেন।]

ওরে নবীন, ওরে আমার কাঁচা,
ওরে সবুজ, ওরে অবুঝ,
আধ-মরাদের ঘা মেরে তুই বাঁচা।
রক্ত আলোর মদে মাতাল ভোরে
আজকে যে যা বলে বলুক তোরে,
সকল তর্ক হেলায় তুচ্ছ করে
পুচ্ছটি তোর উচ্চে তুলে নাচা।
আয় দুরন্ত, আয় রে আমার কাঁচা ॥

খাঁচাখানা দুলছে মৃদু হাওয়ায়;
আর তো কিছুই নড়ে না রে
ওদের ঘরে, ওদের ঘরের দাওয়ায় ॥
ওই-যে প্রবীণ, ওই-যে পরম পাকা,
চক্ষুকর্ণ দুইটি ডানায় ঢাকা,
ঝিমায় যেন চিত্রপটে আঁকা
অন্ধকারে বন্ধ-করা খাঁচায়।
আয় জীবন্ত, আয় রে আমার কাঁচা ॥

বাহির পানে তাকায় না যে কেউ,
দেখে না যে বান ডেকেছে,
জোয়ার-জলে উঠছে প্রবল ঢেউ।

চলতে ওরা চায় না মাটির ছেলে
মাটির 'পরে চরণ ফেলে ফেলে,
আছে অচল আসনখানা মেলে
যে যার আপন উচ্চ বাঁশের মাচায়,
আয় অশান্ত, আয় রে আমার কাঁচা ॥

তোরে হেথায় করবে সবাই মানা।
হঠাৎ আলো দেখবে যখন
ভাববে, একী বিষম কাণ্ডখানা !
সংঘাতে তোর উঠবে ওরা রেগে,
শয়ন ছেড়ে আসবে ছুটে বেগে,
সেই সুযোগে ঘুমের থেকে জেগে
লাগবে লড়াই মিথ্যা এবং সাঁচায়।
আয় প্রচণ্ড, আয় রে আমার কাঁচা ॥

* * * * * * * * * * * * * *

আপদ আছে, জানি আঘাত আছে,
তাই জেনে তো বক্ষে পরান নাচে–
ঘুচিয়ে দে, ভাই পুঁথিপোড়োর কাছে
পথে চলার বিধি বিধান যাচা।
আয় প্রমুক্ত, আয় রে আমার কাঁচা ॥

চিরযুবা তুই যে চিরজীবী,
জীর্ণ জরা ঝরিয়ে দিয়ে
প্রাণ অফুরান ছড়িয়ে দেদার দিবি।
সবুজ নেশায় ভোর করেছিস ধরা,
ঝড়ের মেঘে তোরই তড়িৎ ভরা,
বসন্তেরে পরাস আকুল-করা
আপন গলার বকুল-মালাগাছ,
আয় রে অমর, আয় রে আমার কাঁচা ॥

(সংক্ষেপিত)

অনুশীলনমূলক কাজ

উৎস

কবির *বলাকা* কাব্যগ্রন্থ থেকে 'সবুজের অভিযান' কবিতাটি সংকলিত হয়েছে। কবি এই কবিতায় সৃষ্টিশীল সম্ভাবনাময় তারুণ্যের জয়গান গেয়েছেন। তারুণ্যকে তিনি নবীন, কাঁচা, সবুজ, অবুঝ ও দুরন্ত বলে সম্বোধন করেছেন।

মূলবক্তব্য

কবি অমিত শক্তিধর তারুণ্যকে স্বাগত জানিয়েছেন। তারুণ্য এই শক্তিবলে জীর্ণ জরাকে ঝরিয়ে দিয়ে নতুন সৃষ্টি ও সম্ভাবনার পথ নির্মাণ করে। কোনো বাধানিষেধ তার চলার গতিকে রোধ করতে পারে না। প্রাচীনপন্থী প্রবীণরা তরুণদের নানা বিধিবিধানের শৃঙ্খলে বাঁধতে চায়। তারা প্রবীণতার দোহাই দিয়ে তরুণদের পিছু টানে। ফলে নবীন ও প্রবীণ–এ দুটি পক্ষের মধ্যে সংঘাত অনিবার্য হয়ে ওঠে। এই সংঘাতে নবীনদের জয় সুনিশ্চিত। তাদের অফুরন্ত প্রাণশক্তি দেশ ও জাতির কল্যাণের পথ প্রশস্ত করে। তারুণ্য চিরজীবী, অমিত প্রাণশক্তি ও সম্ভাবনার প্রতীক।

শব্দার্থ ও টীকা

পুচ্ছ– লেজ, লাঙুল। **দুর** – অশান্ত, দামাল। **প্রবীণ** – বৃদ্ধ, অভিজ্ঞ। **চিত্রপট** – যে বস্তু বা পটের ওপর ছবি আঁকা হয়। **বিষম** – দারুণ, দুঃসহ। **সংঘাত** – সংঘর্ষ, পরস্পরকে আঘাত করা। **সাঁচা** – সত্য। **দেদার** – প্রচুর।

রক্ত আলোর মদে মাতাল ভোরে – সূর্যালোকে আলোকিত সকালবেলা। রক্তের মতো লাল সে আলো তরুণদের মুক্তির নেশায় পাগল করে তুলেছে। তারা সকল বাধাবিপত্তিকে জয় করে এগিয়ে যাবে।

চিত্রপটে আঁকা – যারা পুরোনো তারা নতুনকে গ্রহণ করতে চায় না। তারা পটে-আঁকা ছবির মতোই নিশ্চল। বাইরের জগতে যে পরিবর্তন সূচিত হয়েছে তারা তা মানতে রাজি নয়। তারা অন্ধকারে বসে চোখকান বুজে আছে।

পুঁথিপোড়ো – এখানে প্রাচীনপন্থী শাস্ত্রকারদের পুঁথিপোড়ো বলা হয়েছে। তারা পুরোনো সংস্কারকে আঁকড়ে ধরে আছে। তারা বিধিবিধানের শৃঙ্খলে তরুণদের বাঁধতে চায়।

মিথ্যা এবং সাঁচা – মিথ্যা ও সত্য। এখানে পুরোনো বিশ্বাসকে মিথ্যা বলা হয়েছে। আর যা-কিছু নতুন তাকে সাঁচা বা সত্য বলে অভিহিত করা হয়েছে।

সবুজ নেশা – সবুজ প্রাণপ্রাচুর্যের প্রতীক। তরুণেরা সেই প্রাণের ঐশ্বর্যকে নতুন সৃষ্টির কাজে লাগাবে।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

উদ্ধৃত অংশটি পড় এবং ১, ২ ও ৩ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও।

তোরে হেথায় করবে সবাই মানা।
হঠাৎ আলো দেখবে যখন
ভাববে একি বিষম কাণ্ড খানা!

১. নবীনদের চলার পথে 'মানা' করবে কারা ?

i. বৃদ্ধরা
ii. প্রাচীনপন্থিরা
iii. অগ্রগামীরা

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i ও ii
খ. i ও iii
গ. ii ও iii
ঘ. i, ii ও iii

২. প্রবীণরা কিসের আলো দেখতে পাবে ?

ক. সাহসের
খ. সম্ভাবনার
গ. প্রভাবের
ঘ. বীরত্বের

৩. 'বিষম কাণ্ডখানা' উক্তিটির মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে-

ক. উচ্ছ্বাস
খ. বিস্ময়
গ. আবেগ
ঘ. আনন্দ

সৃজনশীল প্রশ্ন

কবি তারুণ্যশক্তিকে স্বাগত জানিয়েছেন। কবিতায় এই নবীন দলকে বিভিন্ন সম্বোধন পদে ভূষিত করে আহ্বান জানিয়েছেন। কবির কাছে এরা সবুজ, এরা অবুঝ, এরা দুরন্ত, জীবন্ত, অশান্ত, প্রচণ্ড, প্রমুক্ত এরা চিরসুবা আর চিরজীবি।

ক. কবিতাটির উৎস গ্রন্থ কোনটি ?
খ. কবি তারুণ্যশক্তিকে স্বাগত জানিয়েছেন কেন ?
গ. উদ্দীপকে বর্ণিত বিশ্লেষণসমূহ তারুণদের ক্ষেত্রে কীভাবে প্রযোজ্য? যৌক্তিক ব্যাখ্যা দাও।
ঘ. 'তরুণরা অমিত প্রাণশক্তি ও সম্ভাবনার প্রতীক' –উদ্দীপকের আলোকে বিশ্লেষণ কর।

বৃক্ষ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

অন্ধ ভূমিগর্ভ হতে শুনেছিলে সূর্যের আহ্বান
প্রাণের প্রথম জাগরণে, তুমি বৃক্ষ, আদিপ্রাণ;
ঊর্ধ্বশীর্ষে উচ্চারিলে আলোকের প্রথম বন্দনা
ছন্দোহীন পাষাণের বক্ষ-'পরে; আনিলে বেদনা
নিঃসাড় নিষ্ঠুর মরুস্থলে।

* * * * * * * * *

মৃত্তিকার হে বীর সন্তান,
সংগ্রাম ঘোষিলে তুমি মৃত্তিকারে দিতে মুক্তিদান
মরুর দারুণ দুর্গ হতে; যুদ্ধ চলে ফিরে ফিরে;
সন্তরি সমুদ্র -ঊর্মি দুর্গম দ্বীপের শূন্য তীরে
শ্যামলের সিংহাসন প্রতিষ্ঠিলে অদম্য নিষ্ঠায়,
দুস্তর শৈলের বক্ষে প্রস্তরের পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায়
বিজয়-আখ্যানলিপি লিখি দিলে পল্লব-অক্ষরে
ধূলিরে করিয়া মুগ্ধ, চিহ্নহীন প্রান্তরে প্রান্তরে
ব্যাপিলে আপন পন্থা।

বাণীশূন্য ছিল একদিন
জলস্থল শূন্যতল, ঋতুর উৎসবমন্ত্রহীন
শাখায় রচিলে তব সংগীতের আদিম আশ্রয়,
যে গানে চঞ্চল বায়ু নিজের লভিল পরিচয়,
সুরের বিচিত্র বর্ণে আপনার দৃশ্যহীন তনু
রঞ্জিত করিয়া নিল, অঙ্কিল গানের ইন্দ্রধনু
উত্তরীর প্রান্তে প্রান্তে। সুন্দরের প্রাণমূর্তিখানি
মৃত্তিকার মর্ত্যপটে দিলে তুমি প্রথম বাখানি
টানিয়া আপন প্রাণে রূপশক্তি সূর্যলোক হতে,
আলোকের গুপ্তধন বর্ণে বর্ণে বর্ণিলে আলোতে।
ইন্দ্রের অপ্সরী আসি মেঘে মেঘে হানিয়া কঙ্কণ
বাষ্পপাত্র চূর্ণ করি লীলানৃত্যে করেছে বর্ষণ
যৌবন অমৃতরস, তুমি তাই নিলে ভরি ভরি
আপনার পত্রপুষ্পপুটে, অনন্তযৌবনা করি
সাজাইলে বসুন্ধরা।

(সংক্ষেপিত)

অনুশীলনমূলক কাজ

উৎস

'বৃক্ষ' কবিতাটি বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের *বনবাণী* কাব্যগ্রন্থ থেকে সংকলিত হয়েছে। এটি তাঁর 'বৃক্ষবন্দনা' শীর্ষক সুদীর্ঘ কবিতার অংশবিশেষ। কবি এই কবিতায় পৃথিবীকে সুন্দর ও শোভন এবং মানুষের বসবাসের উপযোগী করে তোলার ক্ষেত্রে বৃক্ষের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা বলেছেন।

মূলবক্তব্য

মৃত্তিকার কঠিন আবরণ ভেদ করে বৃক্ষের উদ্ভব ঘটে। আলোকের আহ্বানে সে ঊর্ধ্বলোকে মাথা তুলে দাঁড়ায়। বৃক্ষের আবির্ভাবের মধ্য দিয়ে ঊষর ধরণী সবুজে-শ্যামলে সুশোভিত হয়। বৃক্ষ মৃত্তিকার নির্ভীক সন্তান– মরুর দহনজ্বালা থেকে সে মুক্তি দান করেছে মৃত্তিকাকে। দুর্গম পাহাড়ের বুকে, দূর সমুদ্রের দ্বীপমালার শ্যামল সমারোহ বৃক্ষেরই অবদান। ধরণীর বুকে ঋতুর উৎসব বৃক্ষের রূপবৈচিত্র্যের মধ্য দিয়ে প্রকাশ লাভ করে। বৃক্ষের শাখায় চঞ্চল বায়ুপ্রবাহের মধ্যে একদা সংগীতের সূচনা ঘটেছে। সূর্যালোক থেকে বিচিত্র বর্ণ আহরণ করে বৃক্ষ পৃথিবীকে মনোহারিণী ও রূপসী করেছে। বস্তুত বৃক্ষ বসুন্ধরাকে করেছে সুন্দরী, অনন্তযৌবনা।

শব্দার্থ ও টীকা

ভূমিগর্ভ – মৃত্তিকার অভ্যন্তর ভাগ। **নিঃসাড়** – সাড়াহীন, প্রাণহীন, নির্জীব। **সমুদ্র-ঊর্মি** – সাগরের ঢেউ। **শৈল** – পাহাড়। **পল্লব** – কচিপাতা, কিশলয়। **পন্থা** – পথ, উপায়। **বাণীশূন্য** –নির্বাক, নীরব। **ইন্দ্রধনু** –রংধনু। ধনুকের মতো দেখতে, বিচিত্র। **ইন্দ্রের অপ্সরী** – স্বর্গের সুন্দরী রমণী, সুরসুন্দরী। **বসুন্ধরা** – পৃথিবী। **কঙ্কণ** – কাঁকন।

আলোকের প্রথম বন্দনা – বৃক্ষের উদ্ভবের মধ্য দিয়ে মৃত্তিকার কঠিন বুকে প্রাণের জাগরণ ঘটে। বৃক্ষ ঊর্ধ্বশির, সে আলোর পূজারি। সূর্যালোক থেকে সে প্রাণশক্তি লাভ করে।

মৃত্তিকার বীর সন্তান – বৃক্ষই মাটিকে উর্বরাশক্তি দান করেছে। মরুময় পৃথিবী বৃক্ষের জন্মের মধ্য দিয়ে শ্যামল শোভায় ভরে ওঠে। বৃক্ষ তার বুকে স্নিগ্ধ প্রশান্তি সৃষ্টি করে।

আলোকের গুপ্তধন– আলোক বিচিত্র বর্ণের উৎস। এই আলোক থেকে বৃক্ষ তার পত্র-পুষ্পে বিচিত্র বর্ণ আহরণ করে পৃথিবীকে সুন্দর ও সুশোভন করেছে।

অনুশীলনী

ক. বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ১ ও ২ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

বৃক্ষের রূপবৈচিত্র্য সাধনের কারণেই ধরণীর বুকে ঋতুবদলের উৎসব হয়। বৃক্ষের পত্রপুষ্প বিকাশের অনন্ত সমাহারের মধ্য দিয়ে সৌন্দর্যে পরিপূর্ণ হয় ধরণী। বাতাসের সঙ্গে বৃক্ষশাখার সংযোগে প্রথম বিচিত্র সুরে সংগীতের মূর্চ্ছনা সৃষ্টি হয়।

১. ঋতুর উৎসবের স্রষ্টা কে ?

ক. বায়ু খ. বৃক্ষ

গ. মৃত্তিকা ঘ. রঙ

২. উদ্দীপকের চিত্রকল্পটিতে মূলত ফুটে উঠেছে–

i. বৃক্ষের রঙ ও রূপ

ii. ধরণীর অনন্ত যৌবন

iii. বায়ুপ্রবাহে সুরের সৃষ্টি

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক i ও ii খ. i ও iii

গ. ii ও iii ঘ. iii

৩. 'অঙ্কিল গানের ইন্দ্রধনু/ উত্তরীর প্রান্তে প্রান্তে'–পঙ্‌ক্তিটির অর্থ কী?

ক. বৃক্ষ পত্রপুষ্পে সুশোভিত

খ. সৌন্দর্যে পরিপূর্ণ ধরণী

গ. বায়ু সংগীতের সুর সৃষ্টি করে

ঘ. ঋতুতে রঙের উৎসব হয়

৪. 'ছন্দোহীন পাষাণের বক্ষ-'পরে; আনিলে বেদনা'–পঙ্‌ক্তিতে কোন বেদনার কথা বলা হয়েছে?

ক. ছন্দের খ. সৃষ্টির

গ. ব্যর্থতার ঘ. গ্লানির

খ. সৃজনশীল প্রশ্ন

১. নিচের অংশটুকু পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

অন্ধ ভূমিগর্ভ হতে শুনেছিলে সূর্যের আহ্বান
প্রাণের প্রথম জাগরণে, তুমি বৃক্ষ, আদিপ্রাণ;
ঊর্ধ্বশীর্ষে উচ্চারিলে আলোকের প্রথম বন্দনা
ছন্দোহীন পাষাণের বক্ষ-'পরে; আনিলে বেদনা
নিঃসাড় নিষ্ঠুর মরুস্থলে।

ক. উদ্দীপকের কবিতাংশের কবির নাম কী?

খ. 'অন্ধ ভূমিগর্ভ হতে শুনেছিলে সূর্যের আহ্বান' এ উক্তি দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে? – ব্যাখ্যা কর।

গ. বর্তমানের পরিবেশ আন্দোলনের সঙ্গে উদ্ধৃতির অংশটুকু কতটা তাৎপর্যপূর্ণ– ব্যাখ্যা কর।

ঘ. 'ছন্দোহীন পাষাণের বক্ষ-'পরে; আনিলে বেদনা
নিঃসাড় নিষ্ঠুর মরুস্থলে।' –এ অংশটুকুর তাৎপর্য বিশ্লেষণ কর।

ধনধান্য পুষ্পভরা

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

[কবি-পরিচিতি : দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ১৮৬৩ খ্রিষ্টাব্দে পশ্চিমবঙ্গের নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ডি. এল. রায় নামে সমধিক পরিচিত। ঐতিহাসিক নাটক ও হাসির গান রচনায় তিনি খ্যাতি অর্জন করেন। ঐতিহাসিক নাটকগুলোতে একদিকে তাঁর স্বদেশপ্রেম ও অন্যদিকে পরাধীনতা থেকে সৃষ্ট সমবেদনা প্রকাশ পেয়েছে। হাসির গানে তিনি কাপুরুষতা ও সংকীর্ণতাকে আঘাত করেছেন। কবিতায় ছন্দ প্রয়োগের ক্ষেত্রেও তিনি কুশলতা দেখিয়েছেন। *তারাবাঈ, প্রতাপসিংহ, নূরজাহান, মেবার পতন, সাজাহান, চন্দ্রগুপ্ত* ইত্যাদি তাঁর প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক নাটক। তাঁর উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ হচ্ছে : *আষাঢ়ে, হাসির গান, মন্দ্র, আলেখ্য* ও *ত্রিবেণী*। ১৯১৩ সালে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।]

ধনধান্য পুষ্পভরা আমাদের এই বসুন্ধরা;
তাহার মাঝে আছে দেশ এক– সকল দেশের সেরা;
ও সে স্বপ্ন দিয়ে তৈরী সে দেশ স্মৃতি দিয়ে ঘেরা;
এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি,
সকল দেশের রানী সে যে– আমার জন্মভূমি।

চন্দ্র সূর্য গ্রহ তারা, কোথায় উজল এমন ধারা!
কোথায় এমন খেলে তড়িৎ এমন কালো মেঘে!
তারা পাখির ডাকে ঘুমিয়ে, ওঠে পাখির ডাকে জেগে।
এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি
সকল দেশের রানী সে যে– আমার জন্মভূমি।

এমন স্নিগ্ধ নদী কাহার, কোথায় এমন ধূম্র পাহাড়;
কোথায় এমন হরিৎক্ষেত্র আকাশতলে মেশে।
এমন ধানের ওপর ঢেউ খেলে যায় বাতাস কাহার দেশে।
এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি
সকল দেশের রানী সে যে– আমার জন্মভূমি।

পুষ্পে পুষ্পে ভরা শাখী; কুঞ্জে কুঞ্জে গাহে পাখি,
গুঞ্জরিয়া আসে অলি পুঞ্জে পুঞ্জে ধেয়ে–
তারা ফুলের ওপর ঘুমিয়ে পড়ে ফুলের মধু খেয়ে।

ভায়ের মায়ের এমন স্নেহ, কোথায় গেলে পাবে কেহ?
–ওমা তোমার চরণ দুটি বক্ষে আমার ধরি,
আমার এই দেশেতে জন্ম–যেন এই দেশেতে মরি–
এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি,
সকল দেশের রানী সে যে–আমার জন্মভূমি।

অনুশীলনমূলক কাজ

উৎস

‘ধনধান্য পুষ্পভরা’ কবির রচিত একটি জনপ্রিয় দেশাত্মবোধক গান। এটি তাঁর *সাজাহান* নাটক থেকে গৃহীত। কবি এ গানটিতে ‘সকল দেশের সেরা’ মাতৃভূমির মনোহারিণী দেশাত্মবোধক চিত্র অঙ্কন করেছেন।

মূলবক্তব্য

স্বপ্নময় স্মৃতিময় আমাদের এ দেশ– আমাদের প্রিয় জন্মভূমি। দেশের প্রতিটি মানুষের কাছে জন্মভূমির কোনো তুলনা নেই। এ দেশের নির্মল আকাশে চন্দ্রসূর্য অকৃপণ আলো ছড়িয়ে দেয়। নদ-নদী, পাহাড়-পর্বত, দিগন্তবিস্তৃত ফসলের মাঠ, ফুলে-ফলে আনত বৃক্ষশাখা এ দেশকে রূপে রূপে অপরূপ করে তুলেছে। পাখির গান, ভ্রমরের গুঞ্জন আর সবার ওপরে মা ও ভাইবোনের স্নেহ এ দেশের মানুষের মনে দিয়েছে তৃপ্তি। এ দেশে জন্মলাভ করে আমরা গর্বিত।

শব্দার্থ ও টীকা

বসুন্ধরা – পৃথিবী। **উজল** – উজ্জ্বল। **হরিৎক্ষেত্র** – সবুজক্ষেত্র। **শাখী** – বৃক্ষ। **কুঞ্জ** – লতাপাতায় ঢাকা ঘরের মতো দেখা যায় এমন স্থান। **পুঞ্জ** – দল, স্তূপ জমে উঠেছে এমন।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. “–ওমা তোমার চরণ দুটি বক্ষে আমার ধরি,
আমার এই দেশেতে জন্ম–যেন এই দেশেতে মরি–”
চরণদ্বয়ে যে তাৎপর্য ফুটে উঠেছে তা হলো :

i. জন্মস্থানের ওপর মানুষের ভালোবাসা চিরন্তন
ii. আপন গণ্ডিতেই মানুষ হইলীলা সাঙ্গ করতে চায়
iii. জন্মভূমির মাটিতেই সবাই চিরনিদ্রায় শয়ন করতে চায়

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i   খ. i ও ii
গ. ii ও iii   ঘ. i, ii ও iii

২. ‘কোথায় এমন হরিৎক্ষেত্র আকাশতলে মেশে।’-এখানে ‘হরিৎক্ষেত্র’ বলতে কোনটিকে বোঝানো হয়েছে ?

ক. দিগন্ত বিস্তৃত সবুজ মাঠ   খ. আকাশ ও মাটির মিতালি
গ. আবহমান বাংলার সৌন্দর্য   ঘ. বাংলার মাটির সজীবতা

নিচের বক্তব্য পড়ে ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও।

মাটি ও মানুষের যে অকৃত্রিম বন্ধন রচিত হয় তার ওপর ভিত্তি করেই মানুষ স্বদেশের সমৃদ্ধি ও সম্ভাবনার স্বপ্ন দেখে। স্বদেশকে সবার ওপরে স্থান দেয়। জন্মভূমি যেন সকল দেশের রাণী হিসেবে বিবেচিত হয়।

৩. স্বদেশকে কোন নামে অভিহিত করা হয়েছে ?

ক. স্বপ্ন দিয়ে তৈরী
খ. রূপের আকর
গ. সকল দেশের রাণী
ঘ. সম্ভাবনার প্রতীক

৪. মাটি ও মানুষের মধ্যে যে অকৃত্রিম বন্ধন রচিত হয় তা কোন প্রেক্ষাপটে সমর্থনযোগ্য-

i. দেশাত্ববোধ মানুষকে দেশের প্রতি দায়বদ্ধ করে
ii. দেশের সম্পদ ভোগ করে সে তৃপ্তি পায়
iii. দেশের আহ্বান সে কোনোভাবেই এড়াতে পারে না

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i
খ. i ও ii
গ. i ও ii
ঘ. i ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং নিম্নলিখিত প্রশ্নের উত্তর দাও।

স্বদেশের সৌন্দর্য মানুষকে আপ্লুত করে, কেননা প্রত্যেকেই তার দেশের মাটি ও মানুষের কাছে দায়বদ্ধ। এদেশের নির্মল আকাশ, বাতাস, চন্দ্র-সূর্য, নদী-নালা, দিগন্তবিস্তৃত মাঠ, মৌমাছির গুনগুন শব্দ ও ফুল-ফলের বিচিত্র সমারোহ যেন স্বদেশের অপরূপ শোভাই আমাদের কাছে তুলে ধরছে। এদৃশ্য আমাদের চোখ জুড়ায়, মনমাতায় এবং দেশাত্ববোধে উদ্বুদ্ধ করে।

ক. ‘ধনধান্য পুষ্পভরা’-এখানে কোন দেশের কথা বলা হয়েছে?
খ. বাংলার সৌন্দর্যকে অপরূপা বলা হয়েছে কেন?
গ. ‘প্রত্যেকেই দেশের মাটি ও মানুষের কাছে দায়বদ্ধ।’-এ বক্তব্যের সমর্থনে তোমার যুক্তি উপস্থাপন কর।
ঘ. উদ্দীপকের আলোকে ‘ধনধান্য পুষ্পভরা’ কবিতার বিষয়বস্তুর তাৎপর্য বিশ্লেষণ কর।

পরার্থে

কামিনী রায়

[**কবি-পরিচিতি :** কামিনী রায় ১৮৬৪ খ্রিষ্টাব্দে বরিশাল জেলার বাসণ্ডা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। উনিশ শতকের শেষদিকে যে কজন বিশিষ্ট মহিলা কবির সাক্ষাৎ মেলে, তাঁদের মধ্যে কামিনী রায় অন্যতম। ১৮৮৬ খ্রিষ্টাব্দে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বেথুন কলেজ থেকে সংস্কৃতে সম্মানসহ বিএ পাস করেন। তাঁর কবিতায় মানুষের জীবনের আশা-নিরাশা, সুখ-দুঃখ, ব্যথা-বেদনার সহজ সাবলীল অভিব্যক্তি ঘটেছে। স্বামীর অকাল বিয়োগে এই উচ্চশিক্ষিতা মহিলার ব্যক্তিগত জীবন দুঃখভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে। সেই দুঃখ-বেদনার প্রতিফলন তাঁর কাব্যসাধনার ক্ষেত্রে লক্ষণীয়। কবির উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ **:** *আলো ও ছায়া, নির্মাল্য, শোক সংগীত, দীপ ও ধূপ, জীবন পথে* ইত্যাদি। ১৯৩৩ খ্রিষ্টাব্দে কবি কামিনী রায় মৃত্যুবরণ করেন।

যাতনা যাতনা কিসেরি যাতনা ?
বিষাদ এতই কিসেরি তরে ?
যদিই বা থাকে, যখন তখন
কি কাজ জানায়ে জগৎ ভরে ?

লুকান বিষাদ আঁধার অমায়
মৃদুভাতি স্নিগ্ধ তারার মত,
সারাটি রজনী নীরবে নীরবে
ঢালে সুমধুর আলোক কত!

লুকান বিষাদ মানব হৃদয়ে
গভীর নিশীথ শান্তির প্রায়,
দুরাশার ভেরী, নৈরাশ চিৎকার
আকাঙ্ক্ষার রব ভাঙে না তায়।

বিষাদ - বিষাদ - বিষাদ বলিয়ে
কেনই কাঁদিবে জীবন ভরে ?
মানবের মন এত কি অসার ?
এতই সহজে নুইয়া পড়ে ?

সকলের মুখ হাসি ভরা দেখে
পার না মুছিতে নয়ন ধার ?
পরহিত ব্রতে পার না রাখিতে
চাপিয়া আপন বিষাদ-ভার ?

আপনারে লয়ে বিব্রত রহিতে
আসে নাই কেহ অবনী 'পরে,
সকলের তরে সকলে আমরা
প্রত্যেকে আমরা পরের তরে।

অনুশীলনমূলক কাজ

উৎস

'পরার্থে' কবিতাটি *কামিনী রায়ের কবিতাবলি* থেকে সংগৃহীত হয়েছে। এ কবিতার প্রতিপাদ্য হচ্ছে ব্যক্তিগত সুখভোগের চেয়ে পরের কল্যাণে জীবন উৎসর্গ করার মধ্য দিয়েই জীবন তাৎপর্যময় হয়ে ওঠে।

মূলবক্তব্য

মানুষের জীবনে সুখের পাশাপাশি থাকে দুঃখ। রাতের আঁধারেও তারকারাজি আকাশে মৃদু আলো বিতরণ করে। বিষাদ-সর্বস্ব জীবন কেবলই মানুষকে দুঃখপীড়িত করে রাখে। এর মধ্যে সংকীর্ণ স্বার্থবোধের ও হীনমনোবৃত্তির পরিচয় পাওয়া যায়। মানুষের মন হবে উদার এবং সহিষ্ণু। জীবনে কঠিন পথে চলতে হবে। এ কথা প্রত্যেক ব্যক্তির মনে রাখা সমীচীন যে, মানুষ সমাজবন্ধ জীব। প্রত্যেকের পারস্পরিক কর্তব্য ও দায়িত্ব পালন করা সামাজিক দায়িত্ব। স্বার্থবুদ্ধি মানুষকে সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখে। শুভবুদ্ধি, সহানুভূতি এবং সহযোগিতার ভাব নিয়ে সমাজে প্রতিটি ব্যক্তি সাহস ও আত্মমর্যাদা নিয়ে বসবাস করলে সামাজিক প্রীতি ও মৈত্রী স্থাপিত হবে। সম্মিলিত মনোভাবই মানুষে মানুষে প্রেম ও নিরাপত্তাবোধ নিয়ে সুখে-শান্তিতে বাস করবার শক্তি, সাহস ও নিষ্ঠা যোগায়।

শব্দার্থ ও টিকা

পরার্থ – পরোপকার। **যাতনা** – যন্ত্রণা। **অমা** – অন্ধকার। **ভাতি** – দীপ্তি। **রজনী** – রাত্রি। **ভেরী** – ঢাক। **নিশীথ** – রাত্রি। **অসার** – অর্থহীন। **নয়ন ধার** – চোখের জল। **পরহিত** – অপরের মঙ্গল। **বিব্রত** – অস্বস্তিবোধ, সংকটাপন্ন। **অবনী** – পৃথিবী।

লুকান বিষাদ আঁধার অমায়/ মৃদুভাতি স্নিগ্ধ তারার মত – ব্যক্তিগত দুঃখ-কষ্ট যদি প্রচার করা হয়, তাতে শান্তি মেলে না, দুঃখ থেকে মুক্তি পাওয়া যায় না। বরঞ্চ দুঃখের তীব্রতা বেড়ে যায়। নিজের দুঃখবোধকে অন্তরে সংগোপনে লালন করে রাখার মধ্যেই হৃদয়ে আসে প্রশান্তির ভাব। রাত্রে আকাশে হাজার হাজার তারা যেমন স্নিগ্ধ আলোকে পৃথিবীর বুকে ঢেলে দেয় প্রশান্তি, তেমনি হৃদয়ে লুকানো বিষাদ মানুষের অন্তরকে গভীর স্বস্তিতে ভরে তোলে।

দুরাশার ভেরী, নৈরাশ চিৎকার / আকাঙ্ক্ষার রব ভাঙে না তায় – মানুষের জীবনে আছে দুরন্ত আশা, আছে নিরাশার বেদনা যা তাকে যন্ত্রণায় দগ্ধ ও বিদ্ধ করে। এক অপার শূন্যতাবোধ জীবনকে করে তোলে অর্থহীন। কিন্তু এছাড়াও জীবনের একটি জাগ্রত অস্তিত্ব আছে, যে অস্তিত্ব মানুষের চৈতন্যে জাগায় আকাঙ্ক্ষা। শত বিপর্যয়ের মুখোমুখি দাঁড়িয়েও সে নতুন আশায় উজ্জীবিত হয়। হতাশা আসে কখনও কখনও, আশা মানুষকে আবারও করে তোলে উদ্দীপ্ত। ইংরেজ কবি আলেক্সান্ডার পোপ বলেছেন : "Hope springs eternal in the human breast" – মানুষের চিত্তে আশার জাগরণ চিরন্তন ; এর শেষ নেই।

'পরার্থে' কবিতায় একই শব্দ পর পর ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন, 'বিষাদ - বিষাদ - বিষাদ'। এ ধরনের শব্দ বাক্যে ব্যবহার করা হয় বিচিত্র ভাব প্রকাশের জন্য, যেমন 'যাতনা যাতনা কিসেরি যাতনা?' এ ছত্রে কবি 'যাতনা' শব্দটির ওপর বিশেষভাবে জোর দিয়েছেন। মানুষের মনে শুধু কি যন্ত্রণাই আছে? আর যদি বা থাকে, যন্ত্রণা মনে লালন করে রাখলেই তা বাড়ে।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. ‘পরার্থে’ কবিতার বিষয়বস্তুর অন্তর্নিহিত তাৎপর্য কী ?

ক. যে কোনো ত্যাগের জন্য নিজেকে প্রস্তুত রাখা
খ. আপন শক্তি সামর্থ্য দ্বারা দুঃখকে জয় করা
গ. বিষাদময় জীবন থেকে বের হয়ে আসা
ঘ. ভোগে নয়, ত্যাগেই জীবনের সার্থকতা নিহিত

২. মানবমনের কষ্টের স্বরূপ সম্পর্কে বলা হয়েছে-

i. নিশার স্নিগ্ধ আলো
ii. প্রকৃতির প্রশান্তি
iii. মনের অসারতা

কোনটিকে মানবমনের কষ্টের প্রতিরূপ হিসেবে ভাবা হয়েছে ?

ক. i
খ. i ও ii
গ. ii ও iii
ঘ. i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদের আলোকে ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও-

দুঃখ ভারাক্রান্ত হয়ে থেকে জীবনকে অসারতার দিকে ঠেলে না দিয়ে আশা-আকাঙ্খা ও স্বপ্ন-সম্ভাবনাকে জাগিয়ে তোলাই বুদ্ধিমানের কাজ। মানুষের হৃদয়ে এই আশার জাগরণ চিরন্তন, এর শেষ নেই। এই আশাকে অবলম্বন করেই মানুষকে হতে হবে উদার ও সহিষ্ণু।

৩. ‘আশার জাগরণ চিরন্তন’-কোন যুক্তিতে এ মন্তব্যটি সমর্থন করা যায়? কেন না এটা-

ক. হৃদয়কে বিচলিত হতে দেয় না
খ. আশার ভেলায় চড়ে আমরা জীবনের ছন্দ ফিরে পাই
গ. আশা অতীতকে ভুলে যেতে সহায়তা করে
ঘ. এটা পৃথিবীর বুকে প্রশান্তি ঢেলে দেয়

৪. দুঃখ কীভাবে জীবনকে অসারতার দিকে ঠেলে দেয়? কারণ এটা-

ক. প্রশান্তির পথে বাধা স্বরূপ
খ. মনের শক্তি কেড়ে নেয়
গ. অতিমাত্রায় আত্মকেন্দ্রিক করে
ঘ. সারা জীবন মানুষকে কাঁদায়

সৃজনশীল প্রশ্ন

নিচের স্তবকটি পড়ে প্রশ্নসমূহের উত্তর দাও-

‘আপনাকে লয়ে বিব্রত রহিতে
আসে নাই কেহ অবনী পরে,
সকলের তরে সকলে আমরা
প্রত্যেকে আমরা পরের তরে।’

ক. ‘অবণী’ শব্দের আভিধানিক অর্থ কী ?
খ. কবি কেন নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত থাকতে বারণ করেছেন ?
গ. ‘স্বার্থপর ব্যক্তিরা জীবনকে পরিপূর্ণভাবে উপভোগ করতে পারে না।’–উদ্দীপকের আলোকে এ মন্তব্যটি প্রমাণ কর।
ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত বিষয়বস্তুর তাৎপর্য বিশ্লেষণ কর।

ঝর্ণা

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

[**কবি-পরিচিতি :** সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দে কলকাতার কাছাকাছি নিমতা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। রবীন্দ্রনাথের স্নেহধন্য এই কবি তাঁর স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল ছিলেন। তাঁর মেজাজে ও কাব্য-নির্মাণ-কৌশলে তিনি রবীন্দ্রনাথের প্রভাবমুক্ত ছিলেন। বাংলা কবিতায় নতুন ছন্দের প্রবর্তনে তিনি গুণগ্রাহীদের কাছে 'ছন্দের জাদুকর' বলে অভিহিত হয়েছেন। ছন্দ নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার সঙ্গে সঙ্গে বাংলা কবিতায় প্রচুর ফারসি ও আরবি শব্দের যথাযথ প্রয়োগে তিনি ছিলেন সুদক্ষ। তাছাড়া একজন সার্থক অনুবাদক রূপেও তিনি সমাদৃত হয়েছেন। *তীর্থ সলিল* ও *তীর্থরেণু* গ্রন্থদুটি তাঁর অনূদিত কবিতার সংকলন। *সবিতা, সন্ধিক্ষণ, বেণু ও বীণা, হোমশিখা, ফুলের ফসল, কুহু ও কেকা, তুলির লিখন, মনিমঞ্জুষা, অভ্র আবির, বিদায় আরতি* ইত্যাদি তাঁর উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ। ১৯২২ খ্রিস্টাব্দে মাত্র চল্লিশ বছর বয়সে কবির অকালমৃত্যু ঘটে।]

ঝর্ণা! ঝর্ণা! সুন্দরী ঝর্ণা!
তরলিত চন্দ্রিকা ! চন্দন-বর্ণা!
অঞ্চল সিঞ্চিত গৈরিকে স্বর্ণে,
গিরি-মল্লিকা দোলে কুন্তলে কর্ণে,
তনু ভরি 'যৌবন' তাপসী অপর্ণা !
ঝর্ণা!

পাষাণের স্নেহধারা! তুষারের বিন্দু!
ডাকে তোরে চিত-লোল উতরোল সিন্ধু।
মেঘ হানে জুঁইফুলী বৃষ্টি ও-অঙ্গে,
চুমা-চুম্‌কির হারে চাঁদ ঘেরে রঙ্গে,
ধূলা-ভরা দ্যায় ধরা তোর লাগি ধর্ণা!
ঝর্ণা!

এস তৃষ্ণার দেশে এস কলহাস্যে—
গিরি-দরী-বিহারিণী হরিণীর লাস্যে,
ধূসরের উষরের কর তুমি অন্ত,
শ্যামলিয়া ও-পরশে কর গো শ্রীমন্ত;
ভরা ঘট এস নিয়ে ভরসায় ভর্ণা;
ঝর্ণা!

শৈলের পৈঠায় এস তনুগাত্রী!
পাহাড়ের বুক- চেরা এস প্রেমদাত্রী!
পান্নার অঞ্জলি দিতে দিতে আয় গো,
হরিচরণ-চ্যুতা গঙ্গার প্রায় গো,

স্বর্গের সুধা আনো মর্ত্যে সুপর্ণা!
ঝর্ণা!

মঞ্জুল ও-হাসির বেলোয়ারি আওয়াজে
ওলো চঞ্চলা! তোর পথ হল ছাওয়া যে!
মোতিয়া মতির কুঁড়ি মূরছে ও-অলকে,
মেখলায়, মরি মরি, রামধনু, ঝলকে!
তুমি স্বপ্নের সখী বিদ্যুৎপর্ণা!
ঝর্ণা !

অনুশীলনমূলক কাজ

উৎস

সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের 'ঝর্ণা' কবিতাটি তাঁর *কাব্যসঞ্চয়ন* থেকে সংগৃহীত হয়েছে। 'ঝর্ণা' কবিতাটি ঝর্ণার লীলাভঙ্গির সঙ্গে সুন্দর সাযুজ্য রেখেই রচিত হয়েছে। ছন্দের নিপুণ ব্যবহার ও অনুপ্রাসের ঝঙ্কার পাহাড়ি কন্যা ঝর্ণার প্রাণচাঞ্চল্যকেই গতিময় করে তুলেছে।

মূলবক্তব্য

ঝর্ণা পাহাড়ি কন্যা– দূর পাহাড়ের সুউচ্চ শিখরে তার জন্ম। ঝর্ণা যেন চন্দন-বর্ণে রঞ্জিত জ্যোৎস্নার তরল ধারা। ঝর্ণাকে এক অপরূপ সুন্দরীর সঙ্গে তুলনা করা যায়। তার দোলায়িত শাড়ির আঁচল পাহাড়ের গৈরিক মাটির সোনারঙে উজ্জ্বল। তার চুলে ও কানে পাহাড়ি ফুল- মল্লিকার অলঙ্কার শোভিত। অথচ সে যেন উষার মতো তপস্বিনী, সংযমী। সাগরের আহ্বান কি তার কানে পৌঁছায়? জুঁইফুলের মতো বৃষ্টির ফোঁটা চাঁদের কিরণে ঝর্ণার জলধারায় চুমকির লহরি হয়ে দোলে। ধূসর ধরণী ঝর্ণার প্রতীক্ষায় দিন গোনে। তার স্পর্শে মাঠ-প্রান্তর সবুজশ্যামলে ভরে ওঠে। পাহাড়ি গুহা থেকে লীলায়িত ভঙ্গিমায় ত্বরিত ছুটে-আসা হরিণীর মতোই ঝর্ণার গতিভঙ্গি। সবুজ শ্যাওলাপড়া পাথরে ঝর্ণার জলরাশি যখন ছিটকে পড়ে তখন তাকে সবুজ পান্নার মতো মনে হয়। ঝর্ণা যেন স্বর্গের অমৃত বয়ে আনে। ঝর্ণার চলার ছন্দে কাচের চুড়ির মধুর ধ্বনি বেজে ওঠে। আর তার এলোচুলে শোভা পায় মোতির মতো গোল বেলকুঁড়ি। অনন্য সুন্দরী ঝর্ণা আমাদের নয়ন ও মনকে মুগ্ধ করে।

আলোচনা

পাহাড়ের গা বেয়ে পাথরে পাথরে ছিটকে ছিটকে আসা বহমান জলধারার সঙ্গে চমৎকার সাযুজ্য রেখেই উজ্জ্বল চিত্রকল্পে ও স্নিগ্ধ লাবণ্যে কবি এ কবিতাটি রচনা করেছেন। কবিতাটি পাঠে গতিছন্দের যে দোলা, তা যেন ঝর্ণারই ঝঙ্কার। এই দোলাকে বজায় রেখে কবিতা আবৃত্তি করে কবিতার অর্থব্যঞ্জনা অনুধাবন করা যাবে। কবিতাটি 'মাত্রাবৃত্ত' ছন্দে রচিত।

শব্দার্থ ও টীকা

ঝর্ণা (আধুনিক বানানরূপ ঝরনা)– পর্বতে সৃষ্ট জলধারা, নির্ঝর। **চন্দ্রিকা**–জ্যোৎস্না। **সিঞ্চিত**–সেচন করা বা ছিটানো হয়েছে এমন। **গৈরিক**–পাহাড়ের গেরুয়ারঙের মাটি। **কুন্তল** –চুল। **অপর্ণা**– যিনি তপস্যাকালে গাছের পাতাও খাননি তাঁর নাম অপর্ণা, দুর্গা, পার্বতী। **উতরোল**–আনন্দে বিহ্বল। **ধর্ণা (ধরনা)**–অভীষ্ট লাভের জন্য কারও কাছে পড়ে থাকা। **কলহাস্য**–হাস্যময় মধুর ধ্বনি। **লাস্য**–লীলায়িত ভঙ্গিমা। **গিরিদরী** –পর্বতগুহা। **উষর** –অনুর্বর। **ভরসায় ভর্ণা**–আশা ও আশ্বাসে ভরা। **পৈঠা**–সিঁড়ি। **হরিচরণ-চ্যুতা গঙ্গা**–পুরাণ কাহিনীতে আছে, একদা গঙ্গা ও শ্রীকৃষ্ণ একে অন্যের প্রতি আকৃষ্ট হন। রাধা এতে রাগ করে গঙ্গাকে হাতের কোষে নিয়ে পান করতে উদ্যত হন। তখন সমস্ত পৃথিবী জলশূন্য হওয়ার উপক্রম হয়। দেবতারা এতে কৃষ্ণের শরণাপন্ন হলে কৃষ্ণ তখন গঙ্গাকে তাঁর চরণ থেকে সরিয়ে দেন। **সুপর্ণা**–সুন্দর পালকযুক্ত পক্ষীবিশেষ। **মঞ্জুল**–মধুর। **বেলোয়ারি**–উৎকৃষ্ট স্বচ্ছকাচে তৈরি। **মোতিয়া**–মোতির মতো গোল কলি, বেলফুল বিশেষ। **বিদ্যুৎপর্ণা** – (পর্ণা-পালক) এখানে বিদ্যুতের মতো ঝলকিত পালক, ডানাযুক্ত স্বর্গপরী। **মেখলা**– কটিভূষণ, কোমরে পরার গয়না। **অলক**–চুল, চূর্ণ কুন্তল। **চিত-লোল**–চিত্ত-চঞ্চল।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত বাংলা কবিতায় নতুন ছন্দের প্রবর্তন করেন। 'ঝর্ণা' কবিতাটি ঝর্ণার লীলাভঙ্গির সঙ্গে সুন্দর সাযুজ্য রেখেই রচিত হয়েছে। ছন্দের নিপুণ ব্যবহার ও অনুপ্রাসের ঝঙ্কার পাহাড়ি কন্যা ঝর্ণার প্রাণচাঞ্চল্যকেই গতিময় করে তুলেছে।

১. নতুন ছন্দ প্রবর্তনের জন্য সত্যেন্দ্রনাথ দত্তকে কী বলে অভিহিত করা হয়েছে ?

ক. ছন্দের রাজা খ. ছন্দসম্রাট

গ. ছন্দের জনক ঘ. ছন্দের জাদুকর

২. 'ঝর্ণার লীলাভঙ্গির সঙ্গে সুন্দর সাযুজ্য'–বলতে বুঝায় ?

i. ঝর্ণার গতি ও কবিতার ছন্দ

ii. বর্ণ ও ছন্দের মিল

iii. ঝর্ণা ও পাহাড়ি সাদৃশ্য

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i　　　খ. i ও ii
গ. ii　　　ঘ. iii

৩. অনুপ্রাসের সার্থক প্রয়োগ কোনটি ?

ক. লুকান বিষাদ মানব হৃদয়ে　　　খ. তাহার মাঝে আছে দেশ এক
গ. গিরি-দরী-বিহারিনী হরিণীর লাস্যে　　　ঘ. এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি

৪. ঝর্ণাকে 'পাহাড়ি কন্যা' বলা হয়েছে কেন ?

ক. পাহাড়ের কোলে অবস্থান　　　খ. ঝর্ণা পাহাড়ি ফুলে অলঙ্কার শোভিত
গ. পাহাড়ি পথে চলে　　　ঘ. পাহাড় থেকে সৃষ্টি

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

শৈলের পৈঠায় এস তনুগাত্রী!
পাহাড়ের বুক-চেরা এস প্রেমদাত্রী!
　পান্নার অঞ্জলি দিতে দিতে আয় গো,
　হরিচরণ-চ্যুতা গঙ্গার প্রায় গো,
স্বর্গের সুধা আনো মর্ত্যে সুপর্ণা! ঝর্ণা!

ক. ঝর্ণা কোথা হতে সৃষ্টি হয় ?
খ. উল্লিখিত অংশটুকুর আলোকে 'ঝর্ণা' কবিতায় চিত্রকল্পের ব্যবহার সম্পর্কে আলোচনা কর।
গ. ঝর্ণার গতি ও কবিতার ছন্দ তোমার অনুভূতিকে কীভাবে আন্দোলিত করে লিখ।
ঘ. 'স্বর্গের সুধা আনো মর্ত্যে সুপর্ণা!'–বিশ্লেষণ কর।

স্বাধীনতা, এই শব্দটি কীভাবে আমাদের হল

নির্মলেন্দু গুণ

কবি-পরিচিতি : নির্মলেন্দু গুণ ১৯৪৫ সালে নেত্রকোণা জেলার কাশবন গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ষাটের দশকের সূচনা থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত তিনি কবিতায় ও গদ্যে স্বচ্ছন্দে সৃজনশীল হলেও কবি হিসেবেই তিনি খ্যাত। তাঁর কবিতায় প্রতিবাদী চেতনা, সমকালীন সামাজিক-রাজনৈতিক জীবনের ছবি যেমন প্রখর, কবিতা-নির্মাণে শিল্প-সৌন্দর্যের প্রতিও তিনি সজাগ। নির্মলেন্দু গুণ পেশায় সাংবাদিক। কাব্য সাহিত্যে অবদানের জন্য তিনি ১৯৮২ সালে বাংলা একাডেমী পুরস্কার লাভ করেছেন। এ ছাড়াও তিনি বিভিন্ন সাহিত্য পুরস্কার ও পদক পেয়েছেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ- *প্রেমাংশুর রক্ত চাই, বাঙলার মাটি বাংলার জল, চাষাভুষার কাব্য, পঞ্চাশ সহস্র বর্ষ*; ছোটগল্প- *আপন দলের মানুষ*। ছোটদের জন্য লেখা উপন্যাস-*কালোমেঘের ভেলা, বাবা যখন ছোট ছিলেন*।

একটি কবিতা লেখা হবে তার জন্য অপেক্ষার উত্তেজনা নিয়ে
লক্ষ লক্ষ উন্মত্ত অধীর ব্যাকুল বিদ্রোহী শ্রোতা বসে আছে
ভোর থেকে জনসমুদ্রের উদ্যান সৈকতে : 'কখন আসবে কবি?'

এই শিশু পার্ক সেদিন ছিল না,
এই বৃক্ষে ফুলে শোভিত উদ্যান সেদিন ছিল না,
এই তন্দ্রাচ্ছন্ন বিবর্ণ বিকেল সেদিন ছিল না।
তা হলে কেমন ছিল সেদিনের সেই বিকেল বেলাটি?
তা হলে কেমন ছিল শিশু পার্কে, বেঞ্চে, বৃক্ষে, ফুলের বাগনে
ঢেকে দেয়া এই ঢাকার হৃদয় মাঠখানি?

জানি, সেদিনের সব স্মৃতি মুছে দিতে হয়েছে উদ্যত
কালো হাত। তাই দেখি কবিহীন এই বিমুখ প্রান্তরে আজ
কবির বিরুদ্ধে কবি,
মাঠের বিরুদ্ধে মাঠ,
বিকেলের বিরুদ্ধে বিকেল,
উদ্যানের বিরুদ্ধে উদ্যান,
মার্চের বিরুদ্ধে মার্চ...।

হে অনাগত শিশু, হে আগামী দিনের কবি,
শিশু পার্কের রঙিন দোলনায় দোল খেতে খেতে তুমি

একদিন সব জানতে পারবে; আমি তোমাদের কথা ভেবে
লিখে রেখে যাচ্ছি সেই শ্রেষ্ঠ বিকেলের গল্প।
সেদিন এই উদ্যানের রূপ ছিল ভিন্নতর।
না পার্ক না ফুলের বাগান,— এসবের কিছুই ছিল না,
শুধু একখণ্ড অখণ্ড আকাশ যেরকম, সেরকম দিগন্ত প্লাবিত
শুধু মাঠ ছিল দুর্বাদলে ঢাকা, সবুজে সবুজময়।
আমাদের স্বাধীনতা প্রিয় প্রাণের সবুজ এসে মিশেছিল
এই ধু ধু মাঠের সবুজে।

কপালে কব্জিতে লালসালু বেঁধে
এই মাঠে ছুটে এসেছিল কারখানা থেকে লোহার শ্রমিক,
লাঙল জোয়াল কাঁধে এসেছিল ঝাঁক বেঁধে উলঙ্গ কৃষক,
হাতের মুঠোয় মৃত্যু, চোখে স্বপ্ন নিয়ে এসেছিল মধ্যবিত্ত,
নিম্ন-মধ্যবিত্ত, করুণ কেরানি, নারী, বৃদ্ধ, ভবঘুরে
আর তোমাদের মতো শিশু পাতা-কুড়ানিরা দল বেঁধে।
একটি কবিতা পড়া হবে, তার জন্য কী ব্যাকুল
প্রতীক্ষা মানুষের : 'কখন আসবে কবি?' 'কখন আসবে কবি?'

শত বছরের শত সংগ্রাম শেষে,
রবীন্দ্রনাথের মতো দৃপ্ত পায়ে হেঁটে
অতঃপর কবি এসে জনতার মঞ্চে দাঁড়ালেন।
তখন পলকে দারুণ ঝলকে তরীতে উঠিল জল,
হৃদয়ে লাগিল দোলা, জনসমুদ্রে জাগিল জোয়ার
সকল দুয়ার খোলা। কে রোধে তাঁহার বজ্রকণ্ঠ বাণী?
গণসূর্যের মঞ্চ কাঁপিয়ে কবি শোনালেন তাঁর অমর কবিতাখানি :
'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম,
এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।'

সেই থেকে স্বাধীনতা শব্দটি আমাদের।

অনুশীলনমূলক কাজ

উৎস

'স্বাধীনতা, এই শব্দটি কীভাবে আমাদের হল' শীর্ষক কবিতাটি নির্মলেন্দু গুণের *চাষাভুষার কাব্য* নামক কাব্যগ্রন্থ থেকে নেওয়া হয়েছে।

শব্দার্থ

উন্মত্ত - দারুণ উত্তেজনায় আবেগবিহ্বল, ক্ষিপ্ত। **শোভিত** - সজ্জিত। **উদ্যান** - বাগান। **উদ্যত** - প্রবৃত্ত, প্রস্তুত। **বিমুখ প্রান্তরে** - বিরুদ্ধ পরিবেশের মাঠে। প্রতিকূল পরিবেশে। **দিগন্ত প্লাবিত** - আকাশ-ছোঁয়া, যে মাঠে দিগন্ত এসে মিশেছে এমন বিশাল। **দূর্বাদলে** - সবুজ ঘাসে। **উলঙ্গ কৃষক** - খালিগায়ের দরিদ্র গ্রামীণ কৃষক। **করুণ কেরানি** - স্বল্প বেতনে দারিদ্র্যের মধ্যে করুণভাবে জীবন-যাপনকারী সাধারণ চাকুরিজীবী কেরানি। **ভবঘুরে** - যাদের কোনো কাজকর্ম নেই, বেকার। **পাতা-কুড়ানিরা** - যারা পাতা-কুড়িয়ে জীবন ধারণ করে। দরিদ্র কিশোর-কিশোরীর দল। **পলকে** - মুহূর্তের মধ্যে। **দারুণ ঝলকে** - প্রচণ্ড ঝলক দিয়ে। প্রচণ্ড আলোর দোলা লাগিয়ে। **গণসূর্যের মঞ্চ** - জনগণের নেতা, যাঁর তেজীয়ান দ্যুতি চারদিকে বিচ্ছুরিত হচ্ছিল তিনি যেন এক গণসূর্য। সেই নেতা যে মঞ্চে দাঁড়িয়ে সেটা তো গণসূর্যের মঞ্চ। তা ছাড়া সেদিন বিকেলে সূর্যের আলোতে ছিল প্রখরতা। **রোধে** - বন্ধ করে দেওয়, বাধা দেওয়া।

শব্দের বিশিষ্ট প্রয়োগ

'স্বাধীনতা, এই শব্দটি কীভাবে আমাদের হল'- কবিতায় কবি অনেক শব্দ বিশেষ অর্থে প্রয়োগ করেছেন। যেমন :

ঢাকার হৃদয় মাঠখানি—কবি এখানে রমনা রেসকোর্সের মাঠকে বাঙালি হৃদয়ের স্মৃতিময় একটি স্থান হিসেবে কল্পনা করেছেন। **সবুজে সবুজময়**—সবুজ ঘাসে আবৃত। **প্রাণের সবুজ**—প্রাণের সজীবতা ও তারুণ্য। **মাঠের সবুজ**—মাঠের সুন্দর সবুজ পরিবেশ। **বজ্রকণ্ঠ**— মেঘাচ্ছন্ন আকাশ থেকে বজ্র বা বিদ্যুতের ধ্বনি প্রচণ্ড শক্তিধর শব্দের মতো। এখানে বঙ্গবন্ধুর কণ্ঠস্বরকে বোঝানো হয়েছে।

টীকা

লক্ষ লক্ষ উন্মত্ত অধীর ব্যাকুল বিদ্রোহী শ্রোতা-

১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ বাংলার মানুষের অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কণ্ঠনিঃসৃত বক্তব্য শোনার জন্য ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে অপেক্ষা করছিল লক্ষ লক্ষ মানুষ। তারা ব্যাকুল হয়ে বসেছিল বঙ্গবন্ধুর অপেক্ষায়। রেসকোর্সের মাঠে এসে তিনি কী নির্দেশ দেন, কী আশার বাণী শোনান সে জন্য সেদিন লক্ষ প্রাণ হয়েছিল আকুল। কারণ পাকিস্তানি শাসকরা সামরিক শক্তি প্রয়োগ করে বাঙালির স্বাধিকার আন্দোলনের বিজয়কে নস্যাৎ করার সমস্ত পরিকল্পনার ছক তৈরি করে বসেছিল। ১৯৭০-এর সাধারণ নির্বাচনে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে বাঙালির বিজয়কে তারা স্বীকার করে নিতে পারেনি। পাকিস্তানি ষড়যন্ত্রকারীদের সামরিক প্রতিভূ ইয়াহিয়া খান ১৯৭১-এর ১লা মার্চ পাকিস্তানের জাতীয় সংসদের অধিবেশন স্থগিত করে দেয়। বঙ্গবন্ধুর আহ্বানে শুরু হয় সমগ্র বাঙালি জাতির ঐক্যবন্ধ অসহযোগ আন্দোলন। বাংলাদেশ হয়ে উঠে গণমানুষের আন্দোলনে টালমাটাল। ক্ষুব্ধ দেশের মানুষ। ফেটে পড়ছে তাদের ক্রোধ। তারা তাকিয়ে আছে তাদের অকৃত্রিম বন্ধু, প্রাণের মানুষ, কোটি মানুষের নেতা শেখ মুজিবের দিকে। সমস্ত দেশের মানুষ যেন এ বিদ্রোহে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। সেদিন রেসকোর্সের মাঠে বঙ্গবন্ধুর বক্তব্য শোনার জন্য যারা এসেছিল সেই লক্ষ লক্ষ মানুষের মনে ছিল ব্যাকুলতা, বঙ্গবন্ধু কী বলবেন আজ। প্রত্যেক শ্রোতাই যেন এক একজন বিদ্রোহী। এ বিদ্রোহ ছিল পাকিস্তানি স্বৈরশাসক ও সামরিকতন্ত্রের বিরুদ্ধে এবং অন্যায় ও ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে।

জনসমুদ্রের উদ্যান সৈকতে-

রমনা রেসকোর্সে সমবেত লক্ষ লক্ষ মানুষের সমাবেশকে কবি কল্পনা করেছেন জনসমুদ্রের বাগানরূপে। সেই জনসমুদ্রের একদিকে ছিল মঞ্চ, কবির দৃষ্টিতে সেটি যেন সেই জনসমুদ্রের তীর।

এই শিশু পার্ক সেদিন ছিল না-

বর্তমানে ঢাকার সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে উত্তরপ্রান্তের একটি অংশ জুড়ে রয়েছে শিশু পার্ক। তখন এ শিশু পার্ক ছিল না, তখন এর নাম ছিল রমনা রেসকোর্স। এ রেসকোর্সের উত্তর প্রান্তে নির্মিত বিরাট প্রশস্ত মঞ্চ থেকে ৭ই মার্চ (১৯৭১) বঙ্গাবন্ধু তাঁর ঐতিহাসিক ভাষণ দিয়েছিলেন। বঙ্গাবন্ধুর ভাষণের সেই স্মৃতিময় স্থানটির কোনো অস্তিত্ব এখন আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। সেখানে এখন নানা রং-বেরঙের টুল-বেঞ্চি, খেলনারাজ্য, আর চারদিকে বাগান। কবি মনে করেন, লক্ষ লক্ষ মানুষের হৃদয় নিংড়ানো 'স্বাধীনতা সংগ্রামের বাণী' যেখান থেকে উচ্চারিত হয়েছিল সে স্মৃতিময় স্থানটি এভাবেই সুকৌশলে ঢেকে দেওয়া হয়েছে।

কখন আসবে কবি ?-

বঙ্গাবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে কল্পনা করা হয়েছে কবিরূপে। কারণ তিনি বাংলাদেশের মানুষের স্বাধীনতার স্বপ্ন ও অনুভূতির রূপকার। তাঁর বাঙালি হৃদয়ের আবেগপ্রবণ প্রকাশকে কবিসুলভই মনে হয়। ১৯৭১ সালের ৫ই এপ্রিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 'নিউজউইক' পত্রিকায় প্রকাশিত এক নিবন্ধে বঙ্গাবন্ধু শেখ মুজিবকে 'রাজনীতির কবি' বলে আখ্যায়িত করে লেখা হয়, তিনি 'লক্ষ লক্ষ মানুষকে আকর্ষণ করতে পারেন সমাবেশে এবং আবেগময় বাগ্মিতায় তরঙ্গের পর তরঙ্গে তাদের সম্মোহিত করে রাখতে পারেন। তিনি রাজনীতির কবি'। সুতরাং বঙ্গাবন্ধুকে 'কবি' অভিধাটি যথার্থভাবেই দিয়েছেন একালের কবি।

কবির বিরুদ্ধে কবি...মার্চের বিরুদ্ধে মার্চ-

কবি এখানে বোঝাতে চেয়েছেন বঙ্গাবন্ধুকে নির্মমভাবে হত্যার পর এদেশে অশুভশক্তির যে উত্থান ঘটেছে তাতে সব ইতিবাচক ভাবনা, সৌন্দর্য ও কল্যাণকে যেন সমাহিত করার প্রয়াস চলেছে।

শ্রেষ্ঠ বিকেলের গল্প

১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ রেসকোর্স ময়দানে যে বিকেলটিতে লক্ষ লক্ষ মানুষ অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিল বঙ্গাবন্ধুর ভাষণ শোনবার জন্য, সে বিকেলটি কবির দৃষ্টিতে ছিল বাংলার মানুষের জন্য শ্রেষ্ঠ বিকেল। কারণ এদিন বিকেলেই তিনি স্বাধীনতার ডাক দিয়েছিলেন।

শতবছরের শত সংগ্রাম শেষে

প্রকৃত পক্ষে বাংলার স্বাধীনতাসূর্য অস্তমিত হয় পলাশীর প্রান্তরে ১৭৫৭ সালে। ১৮৫৭ সালে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন হয়—সিপাহী বিপ্লব। ১৯৩০ সালে চট্টগ্রামে স্বাধীনতা সংগ্রামী বিপ্লবী সূর্য সেনের নেতৃত্বে বৃটিশ বিরোধী সশস্ত্র যুদ্ধ হয় জালালাবাদ পাহাড়ে। অতঃপর পাকিস্তান সৃষ্টির এক বছর পর থেকে শুরু হয় পাকিস্তানি শাসকদের নানা ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রাম। ১৯৪৮ সালের ভাষা সংগ্রাম থেকে ১৯৫২-র ভাষা আন্দোলন, তারপর ১৯৭১ সালে রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধ। সুতরাং ইতিহাসের বহু অধ্যায় পার হয়ে, নানা সংগ্রাম ও ত্যাগের বিনিময়ে আমরা অর্জন করেছি প্রিয় স্বাধীনতা।

অতঃপর কবি এসে মঞ্চে দাঁড়ালেন

বঙ্গাবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বক্তৃতামঞ্চে এসে দাঁড়ালেন লক্ষ লক্ষ মানুষের সামনে।

তখন পলকে দারুণ ঝলকে তরীতে উঠিল জল
হৃদয়ে লাগিল দোলা, জনসমুদ্রে জাগিল জোয়ার
সকল দুয়ার খোলা,-

কবি তাঁর বর্ণনাকে আরও সুন্দর ও অর্থবহ করে তোলার জন্য রবীন্দ্রনাথের 'দেবতার গ্রাস' ও বিষ্ণু দে-র 'ঘোড়সওয়ার' কবিতার চরণ ব্যবহার করেছেন খুব নৈপুণ্যের সঙ্গে। বাংলার মানুষের প্রিয় নেতা বঙ্গবন্ধু তাঁর স্বাধীনতারূপী নৌকার পাল তুলে যখন ডাক দিলেন, তখন জনতার জোয়ারের স্রোতে সে নৌকায় লাগল উদ্দাম হাওয়া, ছুটে চলল সেই স্বপ্নের বহু আকাঙ্ক্ষিত তরী।

বজ্রকণ্ঠ বাণী

সাহসে উদ্দীপ্ত দ্যুতিময় বঙ্গবন্ধুর বাণী।

এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম,
এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।—

১৯৭১-এর ৭ই মার্চ বঙ্গবন্ধু ডাক দেন, এদেশের মুক্তির ডাক দেন তাঁর বক্তব্যের এটাই ছিল মূলকথা। তাঁর এ আহ্বানে সমগ্র দেশবাসী ঐক্যবদ্ধ হয়ে মহান মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং অবশেষে আমরা জয়ী হই।

স্বাধীনতা শব্দটি আমাদের

'স্বাধীনতা' শব্দটি এখন অভিধানের একটি নিছক শব্দ নয়। এ শব্দটির উচ্চারণের সঙ্গে আমাদের সংগ্রাম ও মুক্তির প্রসঙ্গ যুক্ত। তাই ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ যখন বঙ্গবন্ধুর কণ্ঠ থেকে ধ্বনিত হল : এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম, তখন 'স্বাধীনতা' শব্দটি পেল নতুন অর্থ ও ব্যঞ্জনা।

পাঠের উদ্দেশ্য

শিক্ষার্থীদের মনে বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণ, স্বাধীনতা ও দেশপ্রেমের প্রেরণা জাগ্রত করা।

পাঠ পরিচিতি

১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ বঙ্গবন্ধু রমনা রেসকোর্স ময়দানে লক্ষ লক্ষ মানুষের সম্মুখে বজ্রকণ্ঠে পাকিস্তানি স্বৈরশাসনের নিগড় থেকে বাঙালি জাতির মুক্তি ও স্বাধীনতা সংগ্রামের ডাক দেন। বঙ্গবন্ধুর এই ভাষণের মধ্যেই সেদিন সূচিত হয়েছিল আমাদের স্বাধীনতার স্বপ্ন ও মহান মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ার আহ্বান। সেদিন কৃষক-শ্রমিক-মজুর-বুদ্ধিজীবী-শিশু-কিশোর-নারী-পুরুষ-যুবক-বৃদ্ধ সবাই সমবেত হয়েছিল বাঙালির মহান নেতার কথা শোনার জন্য। সবার মনে ছিল আকুলতা। সে আকুলতা ছিল নেতার কাছে স্বপ্নের কথা শোনার জন্য। তাঁর মুখে আশার বাণী শোনার জন্য। রমনার রেসকোর্সে যেখানে সেদিনের মঞ্চ তৈরি হয়েছিল এখন সেখানে তার কোনো চিহ্ন নেই। সে জায়গায় গড়ে উঠেছে শিশুপার্ক। কবি মনে করেন, অনাগত কালের শিশুদের কাছে এই কাথাটি জানিয়ে দেওয়া দরকার যে—এখান থেকেই , এই পার্কের মঞ্চ থেকেই, বাঙালির অমর অজর প্রিয় শব্দ 'স্বাধীনতা' কথাটি উচ্চরিত হয়েছিল। আপামর জনতার সামনে যিনি সেদিন এসে দাঁড়িয়েছিলেন তিনি বাঙালির বড় প্রিয় মানুষ, বাঙালির শিকড় থেকে জেগে ওঠা এক বিদ্রোহী নেতা। তিনি কোনো সাধারণ রাজনীতিবিদ নন, তিনি একজন কবি, একজন রাজনীতির কবি। এ দেশের মানুষের ভালোবাসার গড়া এক মানুষ—জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তিনি সেদিন (৭ই মার্চ ১৯৭১) বিকেলের পড়ন্ত রোদে ডাক দিয়েছিলেন-

'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম,
এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।'

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. 'স্বাধীনতা', এই শব্দটি কীভাবে আমাদের হল' কবিতাটি নির্মলেন্দু গুণের যে কাব্যগ্রন্থ থেকে নেওয়া হয়েছে তা হল :

ক. প্রেমাংশুর রক্ত চাই

খ. বাংলার মাটি বাংলার জল

গ. চাষাভুষার কাব্য

ঘ. পঞ্চাশ সহস্র বর্ষ

২. ' কে রোধে তাঁহার বজ্রকণ্ঠ বাণী ?' উদ্ধৃতিতে যাঁর কথা বলা হয়েছে তিনি হলেন :

ক. কাজী নজরুল ইসলাম

খ. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

গ. মওলানা ভাসানী

ঘ. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

৩. 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।' এই পঙ্ক্তি দুটিকে 'অমর কবিতা' বলা হয়েছে, কারণ :

i. এর মাঝে স্বাধীনতাকামী মানুষের চিরকালের আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত হয়েছে।

ii. এর মাঝে একটি রাজনৈতিক দলের শ্লোগান ধ্বনিত হয়েছে।

iii. পরাধীন বাঙালি জাতির হাজার বছরের মুক্তি-সংগ্রামের পরিণতি ব্যক্ত হয়েছে।

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i ও ii   খ. ii ও iii

গ. i ও iii   ঘ. i, ii ও iii

৪. 'স্বাধীনতা, এই শব্দটি কীভাবে আমাদের হলো' কবিতায় 'কবি' বলে কাকে সম্বোধন করা হয়েছে।

ক. নির্মলেন্দু গুণকে   খ. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে

গ. কাজী নজরুল ইসলামকে   ঘ. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে

সৃজনশীল প্রশ্ন

১। শত বছরের শত সংগ্রাম শেষে,

রবীন্দ্রনাথের মতো দৃপ্ত পায়ে হেঁটে

অতঃপর কবি এসে জনতার মঞ্চে দাঁড়ালেন।

তখন পলকে দারুণ ঝলকে তরীতে উঠিল জল,

হৃদয়ে লাগিল দোলা, জনসমুদ্রে জাগিল জোয়ার

সকল দুয়ার খোলা। কে রোধে তাঁহার বজ্রকণ্ঠ বাণী ?

ক. কবিতাংশটির কবির নাম কী?

খ. রবীন্দ্রনাথের মতো দৃপ্ত পায়ে হেঁটে'—বলতে কী বোঝানো হয়েছে ?—ব্যাখা কর।

গ. উদ্ধৃতির অংশের চেতানর সঙ্গো তোমার পঠিত 'তোমাকে অভিবাদন, বাংলাদেশ' কবিতার সাদৃশ্য নিরূপণ কর।

ঘ. 'জনসমুদ্রে জাগিল জোয়ার'—উক্ত জনসমুদ্রের তাৎপর্য বিশ্লেষণ কর।

জীবন বিনিময়

গোলাম মোস্তফা

[**কবি-পরিচিতি :** গোলাম মোস্তফা ঝিনাইদহ জেলার শৈলকুপা থানার মনোহরপুর গ্রামে ১৮৯৭ খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৯১৮ সালে কলকাতার রিপন কলেজ থেকে বি.এ. পাস করেন। কর্মজীবনে তিনি বিভিন্ন সরকারি বিদ্যালয়ে প্রধানশিক্ষকের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন। কাব্য, উপন্যাস, জীবনী, অনুবাদ ইত্যাদি সাহিত্যের প্রায় সকল শাখায় তাঁর স্বচ্ছন্দ পদচারণা ছিল। কাব্যচর্চার ক্ষেত্রে ইসলামি ঐতিহ্য থেকে তিনি প্রেরণা লাভ করেছিলেন। তাঁর প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ : *রক্তরাগ, খোশরোজ, কাব্যকাহিনী, সাহারা, হাস্নাহেনা, বুলবুলিস্থান, বনি আদম;* উপন্যাস : *ভাঙাবুক, রূপের নেশা, এক মন এক প্রাণ;* জীবনী : *বিশ্বনবী, মরুদুলাল;* অনুবাদ : *কালামে ইকবাল, আল কুরআন, শিকওয়া ও জওয়াবে শিকওয়া* ইত্যাদি। তিনি ১৯৬৪ সালে মৃত্যুবরণ করেন।]

বাদশা বাবর কাঁদিয়া ফিরিছে, নিদ নাহি চোখে তাঁর–
পুত্র তাঁহার হুমায়ুন বুঝি বাঁচে না এবার আর!
চারিধারে তাঁর ঘনায়ে আসিছে মরণ-অন্ধকার।

রাজ্যের যত বিজ্ঞ হেকিম কবিরাজ দরবেশ
এসেছে সবাই, দিতেছে বসিয়া ব্যবস্থা সবিশেষ,
সেবাযত্নের বিধিবিধানের ত্রুটি নাহি এক লেশ।

তবু তাঁর সেই দুরন্ত রোগ হটিতেছে নাকো হায়,
যত দিন যায়, দুর্ভোগ তার ততই বাড়িয়া যায়–
জীবনপ্রদীপ নিভিয়া আসিছে অস্তরবির প্রায়।

শুধাল বাবর ব্যগ্রকণ্ঠে ভিষকবৃন্দে ডাকি,
'বল বল আজি সত্যি করিয়া, দিও নাকো মোরে ফাঁকি,
এই রোগ হতে বাদশাজাদার মুক্তি মিলিবে নাকি?'

নতমস্তকে রহিল সবাই, কহিল না কোনো কথা,
মুখর হইয়া উঠিল তাঁদের সে নিষ্ঠুর নীরবতা
শেলসম আসি বাবরের বুকে বিঁধিল কিসের ব্যথা!

হেনকালে এক দরবেশ উঠি কহিলেন– 'সুলতান,
সবচেয়ে তব শ্রেষ্ঠ যে-ধন দিতে যদি পার দান,
খুশি হয়ে তবে বাঁচাবে আল্লা বাদশাজাদার প্রাণ।

শুনিয়া সে কথা কহিল বাবর শঙ্কা নাহিকো মানি–
'তাই যদি হয়, প্রস্তুত আমি দিতে সেই কোরবানি,
সবচেয়ে মোর শ্রেষ্ঠ যে- ধন জানি তাহা আমি জানি।'

এতেক বলিয়া আসন পাতিয়া নিরিবিলি গৃহতল
গভীর ধেয়ানে বসিল বাবর শান্ত অচঞ্চল,
প্রার্থনারত হাতদুটি তাঁর, নয়নে অশ্রুজল।

কহিল কাঁদিয়া– 'হে দয়াল খোদা, হে রহিম রহমান,
মোর জীবনের সবচেয়ে প্রিয় আমারি আপন প্রাণ,
তাই নিয়ে প্রভু পুত্রের প্রাণ কর মোরে প্রতিদান।'

স্তব্ধ-নীরব গৃহতল, মুখে নাহি কারো বাণী,
গভীর রজনী, সুপ্তি-মগন নিখিল বিশ্বরানী,
আকাশে বাতাসে ধ্বনিতেছে যেন গোপন কী কানাকানি।

সহসা বাবর ফুকারি উঠিল– 'নাহি ভয় নাহি ভয়,
প্রার্থনা মোর কবুল করেছে আল্লাহ যে দয়াময়,
পুত্র আমার বাঁচিয়া উঠিবে—মরিবে না নিশ্চয়।'

ঘুরিতে লাগিল পুলকে বাবর পুত্রের চারিপাশ
নিরাশ হৃদয় সে যেন আশার দৃপ্ত জয়োল্লাস,
তিমির রাতের তোরণে তোরণে ঊষার পূর্বাভাস।

সেইদিন হতে রোগ-লক্ষণ দেখা দিল বাবরের,
হৃষ্টচিত্তে গ্রহণ করিল শয্যা সে মরণের,
নতুন জীবনে হুমায়ুন ধীরে বাঁচিয়া উঠিল ফের।

মরিল বাবর– না, না ভুল কথা, মৃত্যু কে তারে কয়?
মরিয়া বাবর অমর হয়েছে, নাহি তার কোনো ক্ষয়,
পিতৃস্নেহের কাছে হইয়াছে মরণের পরাজয়।

অনুশীলনমূলক কাজ

উৎস

'জীবন বিনিময়' কবিতাটি গোলাম মোস্তফার *বুলবুলিস্তান* কাব্যগ্রন্থ থেকে সংকলিত হয়েছে।

মূলবক্তব্য

কবিতাটিতে পিতৃস্নেহের একটি মহৎ দৃষ্টান্ত উপস্থাপিত হয়েছে। পিতার স্নেহ-বাৎসল্যের কাছে মৃত্যুর পরাজয় এই কবিতার প্রতিপাদ্য বিষয়। মোগল সম্রাট বাবরের পুত্র হুমায়ুন কঠিন রোগে আক্রান্ত। বিজ্ঞ চিকিৎসকেরা অনেক চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়ে তাঁর জীবনের আশা ছেড়ে দিয়েছেন। এক দরবেশ এসে জানালেন যে, সম্রাট যদি তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ ধন দান করেন তবেই তাঁর পুত্র জীবন লাভ করতে পারেন। সম্রাট বাবর উপলব্ধি করলেন, নিজের প্রাণের চেয়ে আর বেশি প্রিয় কিছু নেই। তিনি বিধাতার কাছে সর্বশ্রেষ্ঠ সে-ধনের বিনিময়ে পুত্রের জীবন ভিক্ষা চাইলেন। আল্লাহ তাঁর প্রার্থনা মঞ্জুর করলেন। এভাবে পিতৃস্নেহের কাছে মরণের পরাজয় ঘটল।

শব্দার্থ ও টীকা

বিনিময়–বদল। **নিদ**–ঘুম। **ভিষকবৃন্দ**–চিকিৎসকগণ। **বাদশাজাদা**–সম্রাটের পুত্র, এখানে হুমায়ুন। **শেলসম**–তীক্ষ্ণ অস্ত্রের মতো। **শঙ্কা**–ভয়। **অস্তরবি**–অস্তগামী সূর্য। **দৃপ্ত**–উদ্ধত (এখানে উদ্দীপিত অর্থে ব্যবহৃত)। **সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ যে ধন**–প্রত্যেক মানুষের কাছে নিজের জীবনই শ্রেষ্ঠ ধন হিসেবে বিবেচ্য। **ধেয়ানে**–ধ্যানে। **সুপ্তিমগ্ন**–ঘুমে অচেতন। **ফুকারি**–চিৎকার করে। **কবুল**–স্বীকার, গৃহীত।

তিমির রাতের তোরণে তোরণে উষার পূর্বাভাস–ভোরের আগমন আঁধার রাতের অবসান ঘোষণা করে। এখানে হুমায়ুনের মুমূর্ষু অবস্থাকে তিমির রাত এবং রোগমুক্তির লক্ষণকে ঊষার পূর্বাভাস বলা হয়েছে।

অনুশীলনী

ক. বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. 'জীবন বিনিময়' কবিতাটির প্রতিপাদ্য বিষয় কী?
   - ক. পিতৃস্নেহের জয়
   - খ. পুত্রের রোগমুক্তি
   - গ. অলৌকিকতার বর্ণনা
   - ঘ. ইতিহাসের স্মৃতিমন্থন

২. কবি গোলাম মোস্তফা হুমায়ুনের জীবনকে কোন উপমায় চিহ্নিত করেছেন ?
   - ক. জীবনপ্রদীপ   খ. অস্তরবি
   - গ. অন্ধকার   ঘ. ঊষার পূর্বাভাস

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩, ৪ ও ৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

পৃথিবীর সকল মানুষের কাছে সর্বশ্রেষ্ঠ ও মূল্যবান ধন হল তার নিজের জীবন। কিন্তু সন্তানবাৎসল্যে আবেগাপ্লুত মানুষ সন্তানের প্রাণ রক্ষার্থে নিজের জীবন বিসর্জন দিতে পারে। ইতিহাসে বাদশা বাবর সন্তানের জন্য আত্মত্যাগী এমনই একটি বিরল দৃষ্টান্ত ।

৩. বাদশা বাবর কে ?

ক. মুঘল সম্রাট　　খ. শের সম্রাট

গ. আকবরের পুত্র　　ঘ. আকবরের পিতা

৪. বাদশা বাবরের আত্মত্যাগের বিনিময়ে রক্ষা পায় কার জীবন?

ক. হুমায়ুনের　　খ. আকবরের

গ. জাহাঙ্গীরের　　ঘ. শাহজাহানের

৫. 'নাহি তার কোনো ক্ষয়'- এখানে কার ক্ষয়ের কথা বলা হয়েছে-

ক. ইতিহাসের　　খ. পিতৃস্নেহের

গ. পিতৃহৃদয়ের　　ঘ. বাৎসল্যের

খ. সৃজনশীল প্রশ্ন

১. উদ্ধৃত অংশটুকু পড় এবং নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

কহিল কাঁদিয়া হে দয়াল খোদা, হে রহিম রহমান,
মোর জীবনের সবচেয়ে প্রিয় আমারি আপন প্রাণ,
তাই নিয়ে প্রভু পুত্রের প্রাণ কর মোরে প্রতিদান।

ক. মানুষের জীবনে সবচেয়ে প্রিয় বস্তু কী ?

খ. উদ্ধৃতির মধ্যে পিতার আকুলতার স্বরূপ ব্যাখ্যা কর।

গ. উদ্দীপকের আলোকে বর্তমান সময়ে পিতা–পুত্র সম্পর্কের চিত্র তুলে ধর।

ঘ. ''উদ্ধৃতির তিনটি পঙ্ক্তি 'জীবন বিনিময়' কবিতার মূল বিষয়'' – উক্তিটির তাৎপর্য বিশ্লেষণ কর।

উমর ফারুক

কাজী নজরুল ইসলাম

[**কবি-পরিচিতি :** কাজী নজরুল ইসলাম ১৮৯৯ খ্রিষ্টাব্দের ২৫শে মে (১১ই জ্যৈষ্ঠ ১৩০৬ বঙ্গাব্দ) পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্গত বর্ধমান জেলার আসানসোল মহকুমার চুরুলিয়া গ্রামের সম্ভ্রান্ত কাজী-পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। শৈশব থেকেই কবিতা রচনার প্রতি তাঁর ঝোঁক ছিল। ১৯১৪ সালে প্রথম মহাযুদ্ধ শুরু হলে নজরুল বাঙালি পল্টনে যোগদান করেন। সৈনিক জীবনের অভিজ্ঞতাকে কবি তাঁর কাব্যসাধনার মধ্যে সঞ্চারিত করেন। তাঁকে বিদ্রোহী কবি বলা হয়। তাঁর কাব্যে পরাধীনতা ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ এবং মানবমর্যাদা ও সৌন্দর্যচেতনা সমন্বিত হয়েছে। কবিতা, নাটক, উপন্যাস, ছোটগল্প, প্রবন্ধ– সাহিত্যের সকল শাখায় তিনি আপন প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন। বাংলা ভাষায় তিনিই প্রথম ইসলামি গান ও গজল রচনা করেন এবং এক্ষেত্রে এখনও কেউ তাঁকে অতিক্রম করতে পারেননি। শ্যামাসংগীত রচনায়ও তিনি অসাধারণ নৈপুণ্য দেখিয়েছেন। মাত্র চল্লিশ বছর বয়সে দুরারোগ্য ব্যাধির আক্রমণে তাঁর সাহিত্যসাধনায় ছেদ পড়ে এবং তিনি দীর্ঘদিন বাকশক্তিরহিত অবস্থায় জীবনযাপন করেন। স্বাধীনতার পর ১৯৭২ সালে কবিকে বাংলাদেশে আনা হয়। তাঁকে বাংলাদেশের নাগরিকত্ব প্রদান করা হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে সম্মানসূচক ডি.লিট.উপাধিতে ভূষিত করে। তিনি স্বাধীন বাংলাদেশের জাতীয় কবির মর্যাদায় অধিষ্ঠিত। তাঁর রচনাবলির মধ্যে *অগ্নিবীণা, বিষের বাঁশী, সাম্যবাদী, সর্বহারা, সিন্ধুহিন্দোল, রিক্তের বেদন, মৃত্যুক্ষুধা, রাজবন্দীর জবানবন্দী* বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কবি ১৯৭৬ সালের ২৯শে আগস্ট (১২ই ভাদ্র, ১৩৮৩ বঙ্গাব্দ) ঢাকায় মৃত্যুবরণ করেন।]

তিমির রাত্রি–'এশা'র আযান শুনি দূর মসজিদে।
প্রিয়-হারা কার কান্নার মতো এ-বুকে আসিয়া বিঁধে !

আমির-উল-মুমেনিন,
তোমার স্মৃতি যে আযানের ধ্বনি জানে না মুয়াজ্জিন।
তকবির শুনি, শয্যা ছাড়িয়া চকিতে উঠিয়া বসি,
বাতায়নে চাই–উঠিয়াছে কি-রে গগনে মরুর শশী ?
ও-আযান, ও কি পাপিয়ার ডাক, ও কি চকোরীর গান ?
মুয়াজ্জিনের কণ্ঠে ও কি ও তোমারি সে আহ্বান ?

আবার লুটায়ে পড়ি।
'সেদিন গিয়াছে'–শিয়রের কাছে কহিছে কালের ঘড়ি।
উমর! ফারুক! আখেরি নবীর ওগো দক্ষিণ-বাহু !
আহ্বান নয়–রূপ ধরে এস– গ্রাসে অন্ধতা-রাহু !
ইসলাম-রবি, জ্যোতি তার আজ দিনে দিনে বিমলিন !
সত্যের আলো নিভিয়া-জ্বলিছে জোনাকির আলো ক্ষীণ।
শুধু অঙ্গুলি-হেলনে শাসন করিতে এ জগতের
দিয়াছিলে ফেলি মুহম্মদের চরণে যে-শমশের
ফিরদৌস ছাড়ি নেমে এস তুমি সেই শমশের ধরি
আর একবার লোহিত-সাগরে লালে-লাল হয়ে মরি!

ইসলাম-সে তো পরশ-মানিক তাকে কে পেয়েছে খুঁজি?
পরশে তাহার সোনা হল যারা তাদেরেই মোরা বুঝি।
আজ বুঝি– কেন বলিয়াছিলেন শেষ পয়গম্বর–
'মোরপরে যদি নবী হত কেউ, হত সে এক উমর।'

* * * * * * * * *

অর্ধ পৃথিবী করেছ শাসন ধুলার তখ্‌তে বসি
খেজুরপাতার প্রাসাদ তোমার বারে বারে গেছে খসি
সাইমুম-ঝড়ে। পড়েছে কুটির, তুমি পড়নি ক' নুয়ে,
ঊর্ধ্বের যারা–পড়ছে তাহারা, তুমি ছিলে খাড়া ভূঁয়ে।
শত প্রলোভন বিলাস বাসনা ঐশ্বর্যের মদ
করেছে সালাম দূর হতে সব ছুঁইতে পারেনি পদ।
সবারে ঊর্ধ্বে তুলিয়া ধরিয়া তুমি ছিলে সব নিচে,
বুকে করে সবে বেড়া করি পার, আপনি রহিলে পিছে।

হেরি পশ্চাতে চাহি–
তুমি চলিয়াছ রৌদ্রদগ্ধ দূর মরুপথ বাহি
জেরুজালেমের কিল্লা যথায় আছে অবরোধ করি
বীর মুসলিম সেনাদল তব বহু দিন মাস ধরি।
দুর্গের দ্বার খুলিবে তাহারা বলেছে শত্রু শেষে–
উমর যদি গো সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করে এসে !
হায় রে, আধেক ধরার মালিক আমির-উল-মুমেনিন
শুনে সে খবর একাকী উষ্ট্রে চলেছে বিরামহীন
সাহারা পারায়ে! ঝুলিতে দু খানা শুকনো 'খবুজ' রুটি
একটি মশকে একটুকু পানি খোর্মা দু তিন মুঠি।
প্রহরীবিহীন সম্রাট চলে একা পথে উটে চড়ি
চলেছে একটি মাত্র ভৃত্য উষ্ট্রের রশি ধরি!
মরুর সূর্য ঊর্ধ্ব আকাশে আগুন বৃষ্টি করে,
সে আগুন-তাতে খই সম ফোটে বালুকা মরুর পরে।
কিছুদূর যেতে উট হতে নামি কহিলে ভৃত্যে, 'ভাই
পেরেশান বড় হয়েছ চলিয়া! এইবার আমি যাই
উষ্ট্রের রশি ধরিয়া অগ্রে, তুমি উঠে বস উটে,
তপ্ত বালুতে চলি যে চরণে রক্ত উঠেছে ফুটে।'

... ভৃত্য দস্ত চুমি
কাঁদিয়া কহিল, 'উমর! কেমনে এ আদেশ কর তুমি?
উষ্ট্রের পিঠে আরাম করিয়া গোলাম রহিবে বসি
আর হেঁটে যাবে খলিফা উমর ধরি সে উটের রশি?'

খলিফা হাসিয়া বলে,
'তুমি জিতে গিয়ে বড় হতে চাও, ভাই রে, এমনি ছলে।
রোজ-কিয়ামতে আল্লাহ যে দিন কহিবে, 'উমর! ওরে
করেনি খলিফা, মুসলিম-জাঁহা তোর সুখ তরে তোরে।'
কি দিব জওয়াব, কি করিয়া মুখ দেখাব রসুলে ভাই।
আমি তোমাদের প্রতিনিধি শুধু, মোর অধিকার নাই।
আরাম সুখের,–মানুষ হইয়া নিতে মানুষের সেবা।
ইসলাম বলে, সকলে সমান, কে বড় ক্ষুদ্র কেবা।

ভৃত্য চড়িল উটের পৃষ্ঠে উমর ধরিল রশি,
মানুষে স্বর্গে তুলিয়া ধরিয়া ধুলায় নামিল শশী।
জানি না, সেদিন আকাশে পুষ্প বৃষ্টি হইল কিনা,
কি গান গাহিল মানুষে সেদিন বন্দী' বিশ্ববীণা।
জানি না, সেদিন ফেরেশতা তব করেছে কি না স্তব –
অনাগত কাল গেয়েছিল শুধু, 'জয় জয় হে মানব।'

* * * * * * * * *

তুমি নির্ভীক, এক খোদা ছাড়া করনি ক' কারে ভয়,
সত্যব্রত তোমায় তাইতে সবে উদ্ধত কয়।
মানুষ হইয়া মানুষের পূজা মানুষেরি অপমান,
তাই মহাবীর খালেদেরে তুমি পাঠাইলে ফরমান,
সিপাহ্-সালারে ইঙ্গিতে তব করিলে মামুলি সেনা,
বিশ্ব-বিজয়ী বীরেরে শাসিতে এতটুকু টলিলে না।

* * * * * * * * *

মানব-প্রেমিক! আজিকে তোমারে স্মরি,
মনে পড়ে তব মহত্ত্ব–কথা–সেদিন সে বিভাবরী
নগর-ভ্রমণে বাহিরিয়া তুমি দেখিতে পাইলে দূরে
মায়েরে ঘিরিয়া ক্ষুধাতুর দুটি শিশু সকরুণ সুরে

কাঁদিতেছে আর দুখিনী মাতা ছেলেরে ভুলাতে হায়,
উনানে শূন্য হাঁড়ি চড়াইয়া কাঁদিয়া অকুলে চায়।
শুনিয়া সকল–কাঁদিতে কাঁদিতে ছুটে গেলে মদিনাতে
বায়তুল-মাল হইতে লইয়া ঘৃত আটা নিজ হাতে,
বলিলে, 'এসব চাপাইয়া দাও আমার পিঠের 'পরে,
আমি লয়ে যাব বহিয়া এ-সব দুখিনী মায়ের ঘরে।'
কত লোক আসি আপনি চাহিল বহিতে তোমার বোঝা,
বলিলে, 'বন্ধু, আমার এ ভার আমিই বহিব সোজা !
রোজ-কিয়ামতে কে বহিবে বল আমার পাপের ভার ?
মম অপরাধে ক্ষুধায় শিশুরা কাঁদিয়াছে, আজি তার

প্রায়শ্চিত্ত করিব আপনি' –চলিলে নিশীথ রাতে
পৃষ্ঠে বহিয়া খাদ্যের বোঝা দুখিনীর আঙিনাতে!

এত যে কোমল প্রাণ,
করুণার বশে তবু গো ন্যায়ের করনি ক'অপমান!
মদ্যপানের অপরাধে প্রিয় পুত্রেরে নিজ করে
মেরেছ দোর্রা, মরেছে পুত্র তোমার চোখের পরে!
ক্ষমা চাহিয়াছে পুত্র, বলেছ পাষাণে বক্ষ বাঁধি –
'অপরাধ করে তোরি মতো স্বরে কাঁদিয়াছে অপরাধী।'

আবু শাহমার গোরে
কাঁদিতে যাইয়া ফিরিয়া আসি গো তোমারে সালাম করে।

খাস দরবার ভরিয়া গিয়াছে হাজার দেশের লোকে,
'কোথায় খলিফা' কেবলি প্রশ্ন ভাসে উৎসুক চোখে,
একটি মাত্র পিরান কাচিয়া শুকায়নি তাহা বলে,
রৌদ্রে ধরিয়া বসিয়া আছে গো খলিফা আঙিনা-তলে।
হে খলিফাতুল-মুসলেমিন! হে চীরধারী সম্রাট!
অপমান তব করিব না আজ করিয়া নান্দী পাঠ,
মানুষেরে তুমি বলেছ বন্ধু, বলিয়াছ ভাই, তাই
তোমারে এমন চোখের পানিতে স্মরি গো সর্বদাই।

(সংক্ষেপিত)

অনুশীলনমূলক কাজ

উৎস

'উমর ফারুক' কবিতাটি কাজী নজরুল ইসলামের *জিঞ্জীর* কাব্যগ্রন্থ থেকে সংগৃহীত হয়েছে।

মূলবক্তব্য

'উমর ফারুক' কবিতায় ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হযরত উমর (রা)-এর জীবনাদর্শ, চরিত্র-মাহাত্ম্য, মানবিকতা এবং সাম্যবাদী দৃষ্টিভঙ্গি সুন্দরভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। খলিফা উমর (রা) ছিলেন একজন মহৎ ব্যক্তিত্ব। তাঁর চরিত্রে একাধারে বীরত্ব, কোমলতা, নিষ্ঠা এবং সাম্যবাদী আদর্শের অনন্য সমন্বয় ঘটেছিল। বিশাল মুসলিম রাষ্ট্রের সর্বাধিনায়ক হয়েও তিনি অতি সহজ, সরল, অনাড়ম্বর জীবন যাপন করেছেন। নিজ ভৃত্যকেও তিনি তাঁর সঙ্গে সমান মর্যাদা দিতে কুণ্ঠিত হননি। ন্যায়ের আদর্শ সমুন্নত রাখতে তিনি আপন সন্তানকে কঠোরতম শাস্তি দিতেও দ্বিধাবোধ করেননি। তিনি ছিলেন আমির-উল-মুমেনিন। রাসুলুল্লাহ (স) তাঁকে আদর্শবান ব্যক্তিত্ব বলে বিশ্বাস করেই বলেছিলেন, তাঁর পরে যদি কেউ নবী হতেন, তাহলে তিনি হতেন উমর।

শব্দার্থ ও টীকা

তাপ–উত্তাপ। **হস্ত**–হাত। **পেরেসান**–বিপর্যস্ত, ক্লান্ত। **আমির উল-মুমেনিন** – বিশ্বাসীদের নেতা, এখানে বিশেষভাবে বোঝানো হয়েছে মুসলমানদের ধর্মীয় প্রধান ও রাষ্ট্রীয় নেতা হযরত উমর (রা) -কে। **মুয়াজ্জিন**–যিনি আযান দেন। **তকবির**–'আল্লাহ' ধ্বনি বা রব। **আখেরি**–শেষ। **পরশমণি**–স্পর্শমণি, যার ছোঁয়ায় লোহাও সোনা হয়। **তখ্‌ত**–সিংহাসন। **সাইমুম**–শুকনো উত্তপ্ত শ্বাসরোধকারী প্রবল হাওয়া, বিশেষত মরুভূমির হাওয়া। **মশক**–পানি বইবার চামড়ার থলে। **দোর্রা**–চাবুক। **চীর**–ছিন্নবস্ত্র। **পিরান**–জামা। **নান্দী**–স্তুতি। কাব্যপাঠ বা নাটকের শুরুতে ছোট করে মঙ্গলসূচক প্রশস্তি পাঠ। **শমশের**–তরবারি। **দস্ত**–হাত। **পেরেশান**–বিপর্যস্ত, ক্লান্ত।

উমর ফারুক– ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা। তাঁর খেলাফতের সময়কাল দশ বছর (৬৩৪-৬৪৪ খ্রিষ্টাব্দ)। তাঁর শাসনামলে ইসলামি রাষ্ট্রের সীমা আরবসাম্রাজ্য থেকে মিশর ও তুর্কিস্থানের সীমা পর্যন্ত প্রসারিত হয়। একজন ন্যায়নিষ্ঠ, নির্ভীক ও গণতন্ত্রমনা রাষ্ট্রনায়ক হিসেবে তাঁর খ্যাতি চির অম্লান। 'ফারুক' হযরত উমরের উপাধি। যিনি সত্য ও মিথ্যার মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করতে পারেন তাঁকেই 'ফারুক' বলা হয়। হযরত উমর (রা) ছিলেন সত্যের একজন দৃঢ়চিত্ত উপাসক।

তোমার স্মৃতি যে আযানের ধ্বনি জানে না মুয়াজ্জিন– হযরত উমরের ইসলামধর্ম গ্রহণের পূর্বে নামাযের জন্য প্রকাশ্য আযান দেওয়ার রীতি ছিল না। কোরেশদের ভয়ে মুসলমানরা উচ্চরবে আযান দিতে সাহস পেত না। উমর ছিলেন কোরেশ-বংশোদ্ভূত শ্রেষ্ঠবীর। তিনি যখন ইসলামধর্ম গ্রহণ করলেন, তখন প্রকাশ্যে আযান দিতে আর কোনো বাধা রইল না। তাই আযানের সঙ্গে যে উমরের স্মৃতি বিজড়িত সে-কথা অনেক মুয়াজ্জিন জানেন না।

দিয়েছিলে ফেলি মুহম্মদের চরণে যে-শমশের– হযরত উমর ইসলাম গ্রহণের পূর্বে পৌত্তলিক ছিলেন। একদিন তিনি হযরত মুহম্মদ (স)-কে হত্যা করবার জন্য তরবারি হাতে বের হলেন। পথে জানতে পারলেন, তাঁর বোন ফাতেমা ও ফাতেমার স্বামী ইসলামধর্ম গ্রহণ করেছেন। একথা শুনে ক্ষিপ্ত উমর ছুটে যান বোনের বাড়ির দিকে। বোনের গৃহদ্বারে পৌঁছে তিনি শুনতে পান, গৃহের ভিতর থেকে ভেসে আসা সুললিত কণ্ঠে কুরআন-পাঠ। হযরত উমর তখন তাঁর বোন ও বোনের স্বামীর ইসলামধর্ম গ্রহণের সত্যতা জানতে পারলেন এবং ভগ্নীপতিকে এজন্য প্রহার করলেন। স্বামীকে রক্ষা করতে গিয়ে বোনও আহত হন। তবু তাঁরা ধর্ম ত্যাগ করতে সম্মত হলেন না। উমর যেন এবার সংবিৎ ফিরে পেলেন। তিনি নতুন মানুষে রূপান্তরিত হলেন। তিনি তাঁর বোনের কাছ থেকে বোনের পাঠরত কুরআনের বাণী লিখিত কাগজখানি চেয়ে নিলেন। এ কাগজে লিখিত ছিল সুরা 'তোয়াহা'। তিনি এই সুরা পাঠ করে মুগ্ধ হলেন। অশ্রুসজল হল তাঁর চোখদুটি। তিনি সঙ্গে সঙ্গে ইসলামধর্ম গ্রহণ করলেন। তারপর নিজের ভুলের জন্য ক্ষমাভিক্ষা করতে ছুটে গেলেন মহানবীর (স) কাছে। তরবারি হাতে উমরকে হযরতের (স) নিকট যেতে দেখে নবীর আতঙ্কিত শিষ্যরা তাঁর নিরাপত্তা বিধানের জন্য হযরতের কাছে গিয়ে অবাক বিস্ময়ে দেখলেন, উমর তার তরবারি মহানবীর পদপ্রান্তে সমর্পণ করে কলেমা পাঠ করছেন।

ধুলার তখ্‌ত– ধূলির সিংহাসন। বিশাল মুসলিম রাষ্ট্রের খলিফা কোনো রাজসিংহাসনে বসেননি। তিনি রাজ্য পরিচালনা করতেন মদিনার মসজিদে একটি খেজুরপাতার চাটাইয়ে বসে। বিভিন্ন রাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূতরা এখানে এসেই তাঁর সঙ্গে দেখা করতেন। এই সাধারণ ধূলিধূসরিত চাটাইয়ে বসে তিনি রাজকার্য পরিচালনা করতেন বলে একেই বলা হয়েছে ধুলার তখ্‌ত।

খেজুরপাতার প্রাসাদ– ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হযরত উমর (রা) বিশাল ইসলামি রাষ্ট্রের অধিপতি হয়েও বাস করতেন খেজুরপাতায় ছাওয়া পাথরের দেওয়াল ঘেরা সামান্য গৃহে। কবি এই সাধারণ গৃহকেই রাজপ্রাসাদের মর্যাদা দিয়ে বলেছেন 'খেজুরপাতার প্রাসাদ'।

জেরুজালেম – প্যালেস্টাইন রাষ্ট্রের একটি প্রাচীন শহর জেরুজালেম। হযরত সুলায়মান এই শহরের প্রতিষ্ঠাতা। হিব্রু ভাষায় এর উচ্চারণ 'ইয়ারুশলম'। এখানে হযরত সুলায়মান একটি উপাসনালয় প্রতিষ্ঠা করেন। মুসলমানরা তাকে 'বায়তুল মুকাদ্দাস' বা পবিত্রগৃহ বলে সম্মান করে। ইসলামধর্ম প্রচারের প্রথমদিকে 'বায়তুল মুকাদ্দাস' মুসলমানদের কিব্‌লা ছিল। পরে আল্লাহর ওহি নাযিল হওয়ার পর কাবা শরীফ কিবলারূপে নির্ধারিত হয়। জেরুজালেম খ্রিষ্টান ধর্মাবলম্বীদের নিকট অতি পবিত্র স্থান। যীশু খ্রিস্টের জন্ম হয় এই শহরে। হযরত উমরের সময় যখন জেরুজালেম মুসলমানদের অধিকারে আসে, তখন খলিফা উমর ঐ শহরে যান। তাঁর এ যাত্রাকাহিনী 'উমর ফারুক' কবিতায় বর্ণিত হয়েছে।

খালিদ– ইসলামের ইতিহাসের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বীর খালিদ ইবনে ওয়ালিদ রোমকদের বিরুদ্ধে ইয়ারমুকের যুদ্ধে অপূর্ব রণকৌশল ও বীরত্বের পরিচয় দেন। তাঁর সেনাপতিত্বে যুদ্ধজয়ের ফলে দিন দিন ইসলামি সাম্রাজ্যের সীমা বাড়তে থাকে এবং ইরান ও রোমক সাম্রাজ্য মুসলমানদের হাতে আসে। যুদ্ধনৈপুণ্যের জন্য তিনি উপাধি পান 'সায়ফুল্লাহ' বা 'আল্লাহর তরবারি'। তিনি মহাবীর খালিদকে বিভিন্ন যুদ্ধে তাঁর সেনাবাহিনীর জন্য ব্যয় করা অর্থের হিসাব চেয়ে পত্র পাঠান। বীর খালিদ যোদ্ধা ছিলেন একথা সত্য, কিন্তু হিসাবপত্রে ছিলেন অপটু। তাই তিনি হিসাব প্রদানে তাঁর অপারগতার কথা জানান। ইতোমধ্যে বীর খালিদের অসীম বীরত্ব এবং যুদ্ধজয় তথা রণনৈপুণ্যের স্তুতি গেয়ে এক কবি একটি সুন্দর কবিতা রচনা করেন। খালিদ এই কবিতা পড়ে মুগ্ধ হন এবং অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে কবিকে ১০ হাজার আরবীয় মুদ্রা উপহার দেন। খলিফা এ সংবাদ পেয়ে খালিদকে পদচ্যুত করেন। কেননা, তিনি যদি রাষ্ট্রের কোষ থেকে কোনো অর্থ দেন, তবে সেটা হবে অপব্যয়। খলিফার নির্দেশ খালিদ মাথা পেতে নেন। খলিফা তাঁর এই মহানুভবতায় বিমুগ্ধ হন। তিনি মুসলিম সাম্রাজ্যের সকল প্রাদেশিক গভর্নরকে এই মর্মে চিঠি দেন যে, খালিদকে অর্থব্যয় বা বিশ্বাসভঙ্গের জন্য পদচ্যুত করা হয়নি। তবে ক্রমেই জনগণের মনে একটা ধারণা হচ্ছিল যে, মুসলমানদের জয়ের একমাত্র কারণ খালিদের বীরত্ব। এই ধারণা তাদের মন থেকে দূর করা প্রয়োজন। মুসলমানদের এই সত্যটুকু বুঝতে হবে যে, সবকিছুই আল্লাহর ইচ্ছায় সম্পাদিত হয়ে থাকে। খালিদকে পদচ্যুত করার সিদ্ধান্তে হযরত উমরের চরিত্র, বিচক্ষণ রাষ্ট্রনীতি ও আল্লাহর ওপর একান্ত নির্ভরশীলতার সম্যক পরিচয় পাওয়া যায়। তা ছাড়া যত প্রধান ব্যক্তিই হোক না কেন, আইনের চোখে সকলেই সমান – এই সত্যটুকু বোঝানোর জন্য তাঁর এই নির্দেশ ছিল গুরুত্বপূর্ণ।

আবু শাহমা – হযরত উমরের পুত্র। মদ্যপানের অপরাধে খলিফা তাকে ৮০টি বেত্রাঘাতের নির্দেশ দেন এবং নিজেই বেত্রাঘাত করেন। বেত্রাঘাতের ফলে আবু শাহমার মৃত্যু হয়।

অনুশীলনী

ক. বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. এশার আযানের মধ্য দিয়ে কবি কোন স্মৃতি স্মরণ করছেন-

ক. পাপিয়ার ডাক খ. চকোরীর গান

গ. মুয়াজ্জিনের কণ্ঠস্বর ঘ. উমরের আহ্বান

২। 'মদ্যপানের অপরাধে প্রিয় পুত্রেরে নিজ করে
মেরেছ দোর্রা, মরেছে পুত্র তোমার চোখের পরে!' –পঙ্‌ক্তি দুটিতে উমর ফারুকের কোন চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের ইঙ্গিত আছে?

ক. মানবিকতা খ. সাম্যবাদী দৃষ্টিভঙ্গি

গ. মহানুভবতা ঘ. ন্যায়বিচার

৩. ‘ভৃত্য চড়িল উটের পৃষ্ঠে উমর ধরিল রশি,
মানুষে স্বর্গে তুলিয়া ধরিয়া ধুলায় নামিল শশী।’ –উদ্দীপকের মধ্যে উমর ফারুকের চরিত্রের কোন বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে?

ক. মানবিকতা   খ. সাম্যবাদী দৃষ্টিভঙ্গি
গ. স্নেহপরায়ণতা   ঘ. ন্যায়পরায়ণতা

৪. ‘উমর ফারুক’ কবিতায় কবি তুলে ধরেছেন হযরত উমরের–

i. চারিত্রিক মাধুর্য   ii. জীবনালেখ্য
iii. শাসনব্যবস্থা

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i   খ. ii
গ. i ও ii   ঘ. i ও iii

৫. বর্তমান সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে একজন শাসকের কোন দৃষ্টিভঙ্গি লালন করা প্রয়োজন–

ক. মানবিক   খ. কঠোর
গ. ন্যায়পরায়ণ   ঘ. সাম্যবাদী

খ. সৃজনশীল প্রশ্ন

১. উদ্ধৃতাংশটুকু পড় এবং নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা ছিলেন একজন মহৎ ব্যক্তিত্ব। তাঁর চরিত্রে একাধারে বীরত্ব, কোমলতা, নিষ্ঠা, ন্যায়বিচার ও সাম্যবাদী আদর্শের অনন্য সমন্বয় ঘটেছিল। তিনি সহজ-সরল জীবন যাপন করতেন। ভৃত্যকেও তিনি সমান মর্যাদা দিয়েছিলেন। আপন সন্তানকেও তিনি শাস্তি দিতে কুণ্ঠিত হননি। তিনি ছিলেন সমগ্র মানবের জন্য আদর্শবান ব্যক্তি।

ক. ইসলামের দ্বিতীয় খলিফার নাম কী?
খ. ‘আপনার সন্তানকেও শাস্তি দিতে তিনি কুণ্ঠিত হননি’–এই উক্তির তাৎপর্য ব্যাখ্যা কর।
গ. অনুচ্ছেদটিতে ভৃত্যকে সমান মর্যাদা দেওয়ার যে মানসিকতা ফুটে উঠেছে বর্তমান সমাজে তার কতটুকু প্রতিফলন লক্ষ করা যায় ?
ঘ. উদ্দীপকের আলোকে খলিফার চারিত্রিক মাহাত্ম্য বিশ্লেষণ কর।

কাণ্ডারি হুঁশিয়ার

কাজী নজরুল ইসলাম

১

দুর্গম গিরি কান্তার মরু, দুস্তর পারাবার
লঙ্ঘিতে হবে রাত্রি নিশীতে, যাত্রীরা হুঁশিয়ার!

দুলিতেছে তরি, ফুলিতেছে জল, ভুলিতেছে মাঝি পথ,
ছিঁড়িয়াছে পাল, কে ধরিবে হাল, আছে কার হিম্মৎ?
কে আছ জোয়ান হও আগুয়ান হাঁকিছে ভবিষ্যৎ।
এ তুফান ভারি, দিতে হবে পাড়ি, নিতে হবে তরি পার ॥

২

তিমির রাত্রি, মাতৃমন্ত্রী সান্ত্রীরা সাবধান!
যুগ-যুগান্ত সঞ্চিত ব্যথা ঘোষিয়াছে অভিযান!
ফেনাইয়া ওঠে বঞ্চিত বুকে পুঞ্জিত অভিমান,
ইহাদের পথে নিতে হবে সাথে, দিতে হবে অধিকার।

৩

অসহায় জাতি মরিছে ডুবিয়া, জানে না সন্তরণ,
কাণ্ডারি! আজ দেখিব তোমার মাতৃমুক্তিপণ।
'হিন্দু না ওরা মুসলিম?' ওই জিজ্ঞাসে কোন জন?
কাণ্ডারি! বল ডুবিছে মানুষ, সন্তান মোর মার।

৪

গিরি-সঙ্কট, ভীরু যাত্রীরা, গুরু গরজায় বাজ,
পশ্চাৎ-পথ-যাত্রীর মনে সন্দেহ জাগে আজ!
কাণ্ডারি! তুমি ভুলিবে কি পথ? ত্যজিবে কি পথ-মাঝ?
করে হানাহানি, তবু চল টানি, নিয়াছ যে মহাভার!

৫

কাণ্ডারি! তব সম্মুখে ঐ পলাশীর প্রান্তর,
বাঙালির খুনে লাল হল যেথা ক্লাইভের খঞ্জর!
ঐ গঙ্গায় ডুবিয়াছে হায়, ভারতের দিবাকর।
উদিবে সে রবি আমাদেরই খুনে রাঙিয়া পুনর্বার।

৬

ফাঁসির মঞ্চে গেয়ে গেল যারা জীবনের জয়গান,
আসি অলক্ষ্যে দাঁড়ায়েছে তারা, দিবে কোন বলিদান?
আজি পরীক্ষা জাতির অথবা জাতের করিবে ত্রাণ?
দুলিতেছে তরি, ফুলিতেছে জল, কাণ্ডারি হুঁশিয়ার।

অনুশীলনমূলক কাজ

উৎস

'কাণ্ডারি হুঁশিয়ার' কবিতাটি কাজী নজরুল ইসলাম রচিত *সর্বহারা* কাব্যগ্রন্থ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে।

মূলবক্তব্য

পরাধীনতার শাসন-পাশ থেকে জাতিকে মুক্ত করার জন্য কবি অকুতোভয় বলিষ্ঠ নেতৃত্বের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। ভারতবর্ষের মুক্তি ও স্বাধীনতা-প্রয়াসী জনগণের ওপর সেদিনের বিদেশি শাসন প্রবল আঘাত হেনেছিল। সেই দুর্দিনে, বিপদের সেই আঁধার রাতে, উদ্দাম তরঙ্গসংকুল সাগরের বুকে জাতীয় জীবন-তরণী যাতে অটল সংকল্প ও সুদৃঢ় মনোবল নিয়ে অগ্রসর হয়, কবি সেই আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি সতর্ক পরিচালনায় সমগ্র জাতিকে মুক্তির বন্দরে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য জাতীয় নেতা বা কাণ্ডারিকে উদাত্ত কণ্ঠে আহ্বান জানিয়েছেন। জাতির দুর্দিনে সংকটের সাগর পাড়ি দেওয়ার জন্য নির্ভীক কাণ্ডারির প্রয়োজন।

শব্দার্থ ও টীকা

দুর্গম – যেখানে কষ্টে গমন করা যায়। **গিরি** – পর্বত। **কান্তার**– অরণ্য। **মরু** – মরুভূমি। **দুস্তর** – অলঙ্ঘনীয়। **পারাবার** – সমুদ্র। **হিম্মৎ** – বীরত্ব, সাহস। **তিমির রাত্রি** – আঁধার রাত। **সান্ত্রীরা**– প্রহরীবৃন্দ। **সন্তরণ** – সাঁতার। কাণ্ডারি – কর্ণধার। **গিরিসংকট** – দুই পর্বতের মাঝে সংকীর্ণ পথ। **মহাভার** – গুরুদায়িত্ব। **খুনে** – রক্তে। **বাজ** – বজ্র। **খঞ্জর** – তরবারি, ছোরা। **অলক্ষ্যে** – অগোচরে। **ত্রাণ** – মুক্তি। **মাতৃমন্ত্রী** – মাতৃভূমির মুক্তি ও মঙ্গল সাধনাই যাদের জীবনের মূলমন্ত্র, জন্মভূমির মুক্তিযোদ্ধারা।

পলাশীর প্রান্তরে – ভারতের পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ জেলায় গঙ্গা তীরবর্তী একটি স্থান। এখানে ১৭৫৭ খ্রিষ্টাব্দে বাংলার শেষ স্বাধীন অধিপতি নবাব সিরাজউদ্দৌলা তাঁর প্রধান সেনাপতি মীরজাফরের বিশ্বাসঘাতকতায় ইংরেজ সেনাপতি ক্লাইভের হাতে পরাজিত হন। এর ফলে বাংলার স্বাধীনতার সূর্য ডুবে যায় এবং প্রায় দুশো বছরের ইংরেজশাসন শুরু হয়।

ক্লাইভ – রবার্ট ক্লাইভ ১৭ বছর বয়সে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কেরানি হিসেবে প্রথম মাদ্রাজে আসেন। পরে কোম্পানির অধীনে সৈনিক পদ লাভ করে ক্রমে সেনাপতি হন। ১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধে নবাব সিরাজউদ্দৌলাকে ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে পরাজিত করে বাংলাদেশে ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠা করেন।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. 'কান্ডারি হুঁশিয়ার' কবিতাটি কাজী নজরুল ইসলামের কোন কাব্যগ্রন্থ থেকে নেওয়া হয়েছে ?

ক. জিঞ্জির
খ. অগ্নিবীণা
গ. সর্বহারা
ঘ. সাম্যবাদী

২. ‘লঙ্ঘিতে হবে রাত্রি নিশীতে’–‘কাণ্ডারি হুঁশিয়ার’ কবিতায় এ অংশের অর্থ–

ক. রাতের অন্ধকারে কাজ করতে হবে
খ. রাতের অন্ধকারকে অতিক্রম করতে হবে
গ. ধৈর্যের সঙ্গে দুর্যোগ অতিক্রম করতে হবে
ঘ. স্বাধীনতার পথে সকল অন্তরায় অতিক্রম করতে হবে

৩. কবিতাটিতে কোন সংগ্রামের কথা বলা হয়েছে ?

ক. ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রাম
খ. ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন
গ. শোষিত মানুষের মুক্তি আন্দোলন
ঘ. বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম

৪. “হিন্দু না ওরা মুসলিম?’ ওই জিজ্ঞাসে কোন জন?” –এই উক্তির মধ্যে ধ্বনিত হয়েছে–

i. হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের আহ্বান
ii. জাতিগত ঐক্যের আহ্বান
iii. অসাম্প্রদায়িক জীবনাদর্শের আহ্বান

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i
খ. ii
গ. i ও ii
ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১। উদ্ধৃতিটি পড় এবং নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও ।

অসহায় জাতি মরিছে ডুবিয়া, জানে না সন্তরণ,
কাণ্ডারি! আজ দেখিব তোমার মাতৃমুক্তিপণ।
‘হিন্দু না ওরা মুসলিম?’ ওই জিজ্ঞাসে কোন জন ?
কাণ্ডারি! বল ডুবিছে মানুষ, সন্তান মোর মার ।

ক. ‘কাণ্ডারি হুঁশিয়ারী’ শীর্ষক কবিতাটি নজরুলের কোন কবিতা থেকে নেওয়া হয়েছে ।
খ. ‘অসহায় জাতি মরিছে ডুবিয়া, জানে না সন্তরণ’–এই উক্তির তাৎপর্য ব্যাখ্যা কর ।
গ. তোমার পঠিত পাঠ্যপুস্তকের অন্য কোনো কবিতার বিষয়বস্তুর সঙ্গে উদ্ধৃতির অংশের সম্পর্ক তুলে ধর ।
ঘ. উদ্ধৃতির অংশটুকুর মধ্যে একটি পরাধীন জাতির মুক্তির যে আকাঙ্ক্ষা প্রতিফলিত হয়েছে তা বিশ্লেষণ কর ।

বাংলার মুখ

জীবনানন্দ দাশ

[**কবি-পরিচিতি :** জীবনানন্দ দাশ ১৮৯৯ খ্রিষ্টাব্দে বরিশাল শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম সত্যানন্দ দাশ, মাতা কুসুম-কুমারী দাশ। কুসুমকুমারী দাশও ছিলেন একজন স্বভাবকবি। জীবনানন্দ দাশ বরিশাল ব্রজমোহন স্কুল, ব্রজমোহন কলেজ ও কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে শিক্ষালাভ করেন। ১৯২১ খ্রিষ্টাব্দে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজি সাহিত্যে এম.এ.ডিগ্রি লাভের পর তিনি অধ্যাপনা শুরু করেন এবং সুদীর্ঘকাল তিনি অধ্যাপনার কাজে নিযুক্ত ছিলেন। জীবনানন্দ দাশ প্রধানত আধুনিক জীবনচেতনার কবি হিসেবে পরিচিত। বাংলার প্রকৃতির রূপবৈচিত্র্যে কবি নিমগ্নচিত্ত। কবির দৃষ্টিতে বাংলাদেশ এক অনন্য রূপসী। এ দেশের গাছপালা, লতাগুল্ম, ফুল-পাখি তাঁর আজন্ম প্রিয়। তাঁর রচিত গ্রন্থ : *ঝরা পালক, ধূসর পাণ্ডুলিপি, বনলতা সেন, মহাপৃথিবী, সাতটি তারার তিমির, কবিতার কথা, রূপসী বাংলা, বেলা অবেলা কালবেলা, মাল্যবান, সুতীর্থ* ইত্যাদি। ১৯৫৪ খ্রিষ্টাব্দের ১৪ই অক্টোবর জীবনানন্দ দাশ কলকাতায় এক ট্রাম-দুর্ঘটনায় আহত হন এবং ২২শে অক্টোবর মৃত্যুবরণ করেন।]

বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি, তাই আমি পৃথিবীর রূপ
খুঁজিতে যাই না আর, অন্ধকারে জেগে উঠে ডুমুরের গাছে
চেয়ে দেখি ছাতার মতন বড়ো পাতাটির নিচে বসে আছে
ভোরের দোয়েল পাখি—চারদিকে চেয়ে দেখি পল্লবের স্তূপ
জাম—বট কাঁঠালের—হিজলের—অশ্বত্থের করে আছে চুপ;
ফণীমনসার ঝোপে শটিবনে তাহাদের ছায়া পড়িয়াছে;
মধুকর ডিঙা থেকে না জানি সে কবে চাঁদ চম্পার কাছে
এমনই হিজল-বট-তমালের নীল ছায়া বাংলার অপরূপ রূপ

দেখেছিল; বেহুলাও একদিন গাঙুড়ের জলে ভেলা নিয়ে—
কৃষ্ণা দ্বাদশীর জ্যোৎস্না যখন মরিয়া গেছে নদীর চড়ায়—
সোনালি ধানের পাশে অসংখ্য অশ্বত্থ বট দেখেছিল, হায়,
শ্যামার নরম গান শুনেছিল,—একদিন অমরায় গিয়ে
ছিন্ন খঞ্জনার মত যখন সে নেচেছিল ইন্দ্রের সভায়
বাংলার নদী মাঠ ভাঁটফুল ঘুঙুরের মতো তার কেঁদেছিল পায়।

অনুশীলনমূলক কাজ

উৎস

'বাংলার মুখ' কবিতাটি জীবনানন্দ দাশের *রূপসী বাংলা* কাব্যগ্রন্থ থেকে সংগৃহীত হয়েছে।

মূলবক্তব্য

জন্মভূমি বাংলাদেশকে কবি তাঁর সমগ্র সত্তা দিয়ে ভালোবেসেছেন। এই ভালোবাসা এমনই পরিপূর্ণ যে তিনি পৃথিবীর আর কোথাও বাংলাদেশের প্রকৃতি ও পরিবেশ, ঐতিহ্য ও ঐশ্বর্যের কোনো বিকল্প আছে বলে বিশ্বাস করেন না। কবি এই বাংলার রূপবৈচিত্র্য দু চোখ ভরে দেখেছেন। বাংলার লোককাহিনীর সতী-সাধ্বী বধূ বেহুলাকেও তিনি পরম সমাদরে প্রকৃতির সঙ্গে একাত্ম করে স্মরণ করেছেন। বাংলার অপরূপ সৌন্দর্যের সঙ্গে, নিসর্গের সহজ-সাবলীল ছন্দের সঙ্গে তিনি জীবনের সাযুজ্য খুঁজে পেয়েছেন।

শব্দার্থ ও টীকা

বাংলার মুখ – বাংলাদেশের প্রকৃত চেহারা, বাংলার রূপ ও স্বরূপ; এক কথায়, বাংলাদেশের সত্যিকারপরিচয়। **পৃথিবীর রূপ**–পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের পরিচয়। **গাঙুড়**–নির্দিষ্ট কোনো নদী নয়। গাঙ অর্থাৎ বড় নদী অর্থে ব্যবহৃত। **পল্লব**–পাতা। **ফণীমনসা** –সাপের ফণার মতো দেখতে চ্যাপটা পাতাহীন একরকম কাঁটাগাছ। **মধুকর ডিঙা**–সওদাগরের বাণিজ্যতরীর নাম। লোককাহিনীতে আছে, চাঁদ সওদাগরের সপ্তডিঙা মধুকর নদীতে নিমজ্জিত হয়েছিল। পরে তিনি তা ফিরে পান। **অমরা** – স্বর্গ, ইন্দ্রপুরী।

বেহুলা – *মনসামঙ্গল* কাব্যে চাঁদ সওদাগরের সতী-সাধ্বী পুত্রবধূ, লখিন্দরের পত্নী। বিয়ের রাতে সাপের কামড়ে লখিন্দরের মৃত্যু হলে বেহুলা মৃত স্বামীকে কোলে নিয়ে গাঙ্গুড়ের জলে ভেলায় ভেসে চলে। সংকল্প ছিল, সে ইন্দ্রপুরীতে গিয়ে দেবরাজ ইন্দ্রের কাছে স্বামীর প্রাণভিক্ষা চাইবে। একদিন সে ইন্দ্রপুরীতে পৌছে দেবতাদের অপূর্ব নৃত্য দেখালে দেবতারা পরিতুষ্ট হয়ে তার স্বামীর প্রাণ ফিরিয়ে দেন। কবি মনে করেন, আশায় বুক বেঁধে যখন বেহুলা স্বর্গলোকে নৃত্য পরিবেশন করছিল, তখন তার বারবার মনে পড়ছিল– তার জন্মভূমি বাংলার ছবি। ছিন্ন খঞ্জনার মতো সে যখন ইন্দ্রের সভায় নেচেছিল তখন বাংলার নদী, মাঠ, ভাঁটফুল তাকে অনুপ্রাণিত করেছিল। বেহুলা বাংলার এক চিরন্তনী বধূ, দেবলোকে গিয়েও তা সে ভোলেনি।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. নিচের কোনটি জীবনানন্দ দাশের কাব্যগ্রন্থ ?

ক. মাল্যবান খ. সুতীর্থ

গ. কবিতার কথা ঘ. মহাপৃথিবী

২. কবিতাটিতে বেহুলা কিসের প্রতীক ?

i. চিরকালের বাঙালি নারীর

ii. শাশ্বত বাঙালি মায়ের

iii. প্রেমময়ী বাঙালী বধূর

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i — খ. i ও ii

গ. i ও iii — ঘ. i, ii ও iii

৩. ইন্দ্রের সভায় বেহুলা নেচেছিল কেন ?

ক. নাচের দক্ষতা প্রদর্শনের জন্য — খ. দেবতাগন নাচতে বাধ্য করেছিলেন

গ. বিনোদনে দেবতাদের তুষ্ট করার জন্য — ঘ. মৃত স্বামীকে বাঁচিয়ে তোলার জন্য

সৃজনশীল প্রশ্ন

১। অনুচ্ছেদটি পড় এবং নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও ।

বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি, তাই আমি পৃথিবীর রূপ
খুঁজিতে যাই না আর, অন্ধকারে জেগে উঠে ডুমুরের গাছে চেয়ে
দেখি ছাতার মতন বড় পাতাটির নিচে বসে আছে
ভোরের দোয়েল পাখি-

ক. কবিতাংশটি জীবনানন্দ দাশের কোন কাব্যগ্রন্থ থেকে নেওয়া হয়েছে ?

খ. উদ্ধৃতির অংশে বিধৃত প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের পরিচয় দাও।

গ. ‘পল্লীবর্ষা’ কবিতার প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের সঙ্গে উল্লিখিত অংশটির তুলনামূলক পরিচয় দাও ।

ঘ. উদ্ধৃতির অংশে কবির দেশপ্রেমের যে পরিচয় আছে তা বিচার বিশ্লেষণ কর ।

পল্লীবর্ষা

জসীমউদ্‌দীন

[**কবি-পরিচিতি :** জসীমউদ্‌দীন ১৯০৩ খ্রিষ্টাব্দে ফরিদপুর জেলার তাম্বুলখানা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। কবি তাঁর কবিতায় বাংলাদেশের পল্লীপ্রকৃতি ও মানুষের সহজ স্বাভাবিক রূপটি তুলে ধরেছেন। পল্লীর মাটি ও মানুষের জীবনচিত্র তাঁর কবিতায় নতুন মাত্রা পেয়েছে। পল্লীর মানুষের আশা-স্বপ্ন-আনন্দ-বেদনা ও বিরহ-মিলনের এমন আবেগ-মধুর চিত্র আর কোনো কবির কাব্যে খুঁজে পাওয়া ভার। এ কারণে তিনি ‘পল্লীকবি’ নামে খ্যাত। কর্মজীবনের শুরুতে তিনি কিছুকাল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেন। পরে সরকারি তথ্য ও প্রচার বিভাগে উচ্চপদে যোগদান করেন। ছাত্রজীবনেই তাঁর কবিপ্রতিভার বিকাশ ঘটে। বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালেই তাঁর রচিত ‘কবর’ কবিতাটি প্রবেশিকা বাংলা সংকলনের অন্তর্ভুক্ত হয়। জসীমউদ্‌দীনের উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থের মধ্যে রয়েছে *নকশী কাঁথার মাঠ, সোজন বাদিয়ার ঘাট, রাখালী, বালুচর, হাসু, এক পয়সার বাঁশি, মাটির কান্না* ইত্যাদি। তাঁর *নকশী কাঁথার মাঠ* কাব্য বিভিন্ন বিদেশি ভাষায় অনূদিত হয়েছে। *চলে মুসাফির* তাঁর ভ্রমণকাহিনী। ১৯৭৬ সালের ১৪ই মার্চ কবি ঢাকায় মৃত্যুবরণ করেন।]

আজিকার রোদ ঘুমায়ে পড়িছে ঘোলাটে মেঘের আড়ে
কেয়া-বন-পথে স্বপন বুনিছে ছল ছল জলধারে।
কাহার ঝিয়ারি কদম্ব-শাখে নিঝ্‌ঝুম নিরালায়,
ছোট ছোট রেণু খুলিয়া দেখিছে অস্ফুট কলিকায় !
বাদলের জলে নাহিয়া সে-মেয়ে হেসে কুটি কুটি হয়,
সে হাসি তাহার অধর নিঙাড়ি লুটাইছে বনময়।
কাননের পথে লহর খেলিছে অবিরাম জলধারা,
তারি স্রোতে আজি শুকনো পাতারা ছুটিয়াছে ঘরছাড়া।
হিজলের বন ফুলের আখরে লিখিয়া রঙিন চিঠি,
নিরালা বাদলে ভাসায়ে দিয়েছে না জানি সে কোনা দিঠি !
চিঠির ওপরে চিঠি ভেসে যায় জনহীন বন-বাটে,
না জানি তাহারা ভিড়িবে যাইয়া কার কেয়া-বন-ঘাটে !
কোন সে বিরল বুনো ঝাউ-শাখে বুনিয়া গুলাবি শাড়ি–
হয়তো আজিও চেয়ে আছে পথে কানন-কুমার তারি !
এদিকে দিগন্তে যতদূর চাহি, পাংশু মেঘের জাল,
পায়ে জড়াইয়া পথে দাঁড়ায়েছে আজিকার মহাকাল।

গাঁয়ের চাষিরা মিলিয়াছে আসি মোড়লের দলিজায়,
গল্পে গানে কি জাগাইতে চাহে আজিকার দিনটায় !
কেউ বসে বসে বাখারি চাঁচিছে, কেউ পাকাইছে রশি
কেউবা নতুন দোয়াড়ির গায়ে চাকা বাঁধে কসি কসি।
কেউ তুলিতেছে বাঁশের লাঠিতে সুন্দর করে ফুল,
কেউবা গড়িছে সারিন্দা এক কেটে নির্ভুল।

মাঝখানে বসে গাঁয়ের বৃদ্ধ, করুণ ভাটির সুরে
আমির সাধুর কাহিনী কহিছে সারাটি দলিজা জুড়ে।
লাঠির ওপরে, ফুলের ওপরে আঁকা হইতেছে ফুল,
কঠিন কাঠ সে সারিন্দা হয়ে বাজিতেছে নির্ভুল।
তারি সাথে সাথে গল্প চলেছে, আমির সাধুর নাও
বহু দেশ ঘুরে আজিকে আবার ফিরিয়াছে নিজ গাঁও।
ডাব্বা হুঁকাও চলিয়াছে ছুটি এর হাতে ওর হাতে,
নানান রকম রশি বুনানও হইতেছে তার সাথে।

বাহিরে নাচিছে ঝর ঝর জল, গুরু গুরু মেঘ ডাকে,
এ সবের মাঝে রূপকথা যেন আর রূপকথা আঁকে।
যেন ও বৃদ্ধ, গাঁয়ের চাষিরা, আর ওই রূপকথা,
বাদলের সাথে মিশিয়া গড়িছে আরেক কল্পলতা।
বউদের আজ কোনো কাজ নাই, বেড়ায় বাঁধিয়া রশি,
সমুদ্রকলি শিকা বানাইয়া নীরবে দেখিছে বসি।
কেউবা রঙিন কাঁথায় মেলিয়া বুকের স্বপনখানি,
তারে ভাষা দেয় দীঘল সূতার মায়াবী আখর টানি।
আজিকে বাহিরে শুধু ক্রন্দন ছলছল জলধারে,
বেণু-বনে বায়ু নাড়ে এলোকেশ, মন যেন চায় কারে।

অনুশীলনমূলক কাজ

উৎস

কবিতাটি কবির *ধানখেত* কাব্যগ্রন্থ থেকে গৃহীত। কবি পল্লীগ্রামে বর্ষণমুখর দিনের প্রকৃতির পরিচয় তুলে ধরেছেন এবং এমন দিনে গাঁয়ের মানুষের জীবনে যখন অবকাশ আসে, তখন তারা কীভাবে তা উপভোগ করে, সেই বর্ণনা তুলে ধরেছেন।

মূলবক্তব্য

বাংলাদেশের নিভৃত পল্লীর একটি বর্ষণস্নাত দিন । এমন দিনে পল্লীপ্রকৃতি এক অপূর্ব সৌন্দর্য ধারণ করে। প্রকৃতির এই রূপবৈচিত্র্যের সঙ্গে মিল রেখে পল্লীমানুষের প্রাত্যহিক জীবনেও বৈচিত্র্য সৃষ্টি হয়। ঘোলাটে মেঘের আড়ালে সূর্য ঢাকা পড়েছে। বৃষ্টির অবিরল জলধারা বনপথে অপূর্ব ছন্দ ও সুর তুলেছে। কদমকলি ফুটতে শুরু করেছে। বৃষ্টিস্নাত সেই ফোটা ফুল যেন হেসে কুটিকুটি হচ্ছে। বনপথে ঢেউ তুলেছে জলধারা আর সেই ধারায় ভেসে চলেছে শুকনো পাতার দল। হিজলের বনে ফুলের মেলা বসেছে। হিজল যেন তার ফুলের পাঁপড়িতে চিঠি লিখে কেয়াবনের পথে ভাসিয়ে দিচ্ছে সে চিঠি। বনের কুমার সে চিঠির প্রতীক্ষায় দিন গুনছে। যতদূর দৃষ্টি যায় আকাশে পাংশুটে মেঘের জাল বোনা। মহাকালের গতিও বুঝি হঠাৎ থেমে যায়! বর্ষণমুখর এই দিনে গাঁয়ের চাষিরা জড়ো হয়েছে মোড়লের দহলিজ অর্থাৎ

বাইরের ঘরে। গল্পে আর গানে তারা বর্ষার দিনটিকে আনন্দমুখর করে তুলেছে। এরই মধ্যে কেউ বাখারি চাঁচে, কেউবা দড়ি পাকায়, কেউবা মাঠের কাজ থেকে ছুটি পেয়ে লাঠির গায়ে তোলে ফুলের নকশা। আবার কাঠ কেটে সারিন্দা তৈরি করছে কেউ। কিন্তু সবার মধ্যমণি হয়ে বসেছেন গাঁয়ের বুড়োমানুষটি, তাঁর কণ্ঠে করুণ সুরে আমির সাধুর কাহিনী গীত হয়– সারা আঙিনায় সে সুরমূর্ছনা জাগায়। সবাই তন্ময় হয়ে সে গান শোনে। তবু কারও কাজে ভুল নেই এতটুকু! লাঠির ওপর নকশা আঁকা হচ্ছে, নির্ভুল সুরে বাজছে সারিন্দা। সেইসঙ্গে আমির সাধুর গল্পও চলেছে– বহুদেশ ঘুরে সে বুঝি আজ তার নিজ গ্রামে ফিরে এসেছে। এমন বাদল দিনের পরিবেশে রূপকথার গল্প সকলের মন কেড়ে নেয়। ঘনঘোর বর্ষায় পল্লীবধূর কোনো কাজ নেই। ছুটি পেয়ে কেউবা তৈরি করছে সমুদ্রকলি শিকা, কেউবা নকশিকাঁথায় গভীর অনুরাগে বুনছে রঙিন ফুল। বুকের মাঝে লুকিয়ে রাখা স্বপ্নসূতার টানে যেন ভাষা পাচ্ছে। বাইরে অঝোর ধারায় অবিরল বর্ষণ চলছে। সেই বর্ষণে বাঁশবন নুয়ে পড়ছে। এমন দিনে প্রিয়জনের কথা মনে পড়ছে।

শব্দার্থ ও টীকা

আড়ে– আড়ালে। **ঝিয়ারি**– কন্যা। **রেণু**– পরাগ। **অস্ফুট**– যা এখনও ফোটেনি। **নাহিয়া**– স্নান করে। **লহর**– ঢেউ। **কানন**– বন। **নিরালা**– জনহীন। **দিগন্ত**– যেখানে আকাশ ও পৃথিবী মিলিত হয়েছে বলে মনে হয়, দিকের শেষ সীমা। **মহাকাল**– অনন্তকাল। (এখানে 'সময়' বা 'কাল'-কে প্রতীক হিসেবে ধরা হয়েছে।) **দলিজা<দহলিজ**– বাহিরঘর, বৈঠকখানা। **বাখারি**– বাঁশের ফালি বা চটি। **ডাব্বা হুকা**– নারকেলের মালায় তৈরী হুঁকা। **কল্পলতা**– কল্পনায় সৃষ্ট কাহিনী। **দীঘল সূতায় মায়াবী আখর টানি**– গাঁয়ের বধূ রঙিন কাঁথায় তার অন্তরে লালন করা স্বপ্নটি যেন নকশিকাঁথায় তোলে। হাতে তার দীঘল সুতা, চোখে তার মায়ামাধুরী জড়ানো। প্রিয়জনের কথা স্মরণ করে সে নকশি কাঁথায় নানা ছবি আঁকে। **দোয়াড়ি**– মাছ ধরার উপকরণ। (বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে এটি বিভিন্ন নামে পরিচিত)। **আমির সাধু**– লোককাহিনীর চরিত্র। **দিঠি**– ঠিকানা।

অনুশীলনী

ক. বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

নিচের ৪টি চরণ পড় এবং ১ থেকে ৩ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

হিজলের বন ফুলের আখরে লিখিয়া রঙিন চিঠি,
নিরালা বাদলে ভাসায়ে দিয়েছে না জানি সে কোন দিঠি!
চিঠির ওপরে চিঠি ভেসে যায় জনহীন বন-বাটে,
না জানি তাহারা ভিড়িবে যাইয়া কার কেয়া-বন-ঘাটে!

১. 'রঙিন চিঠি' কোনটি?

ক. বনফুল　　খ. হিজল ফুল
গ. হিজলের রেণু　　ঘ. হিজলের পাপড়ি

২. রঙিন চিঠি কোন পথ দিয়ে যায় ?

ক. কেয়া বনের পথ　　খ. জনহীন বনের পথ
গ. জলের পথ　　ঘ. নিরালা পথ

৩. উল্লিখিত উদ্দীপকে যে চিত্রকল্পটি ফুটে উঠেছে তা–

ক. প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের খ. প্রাত্যহিক জীবনের

গ. পল্লী জীবনের ঘ. বর্ষণস্নাত পল্লীপ্রকৃতির

খ. সৃজনশীল প্রশ্ন

১. ছকটি লক্ষ কর এবং নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।
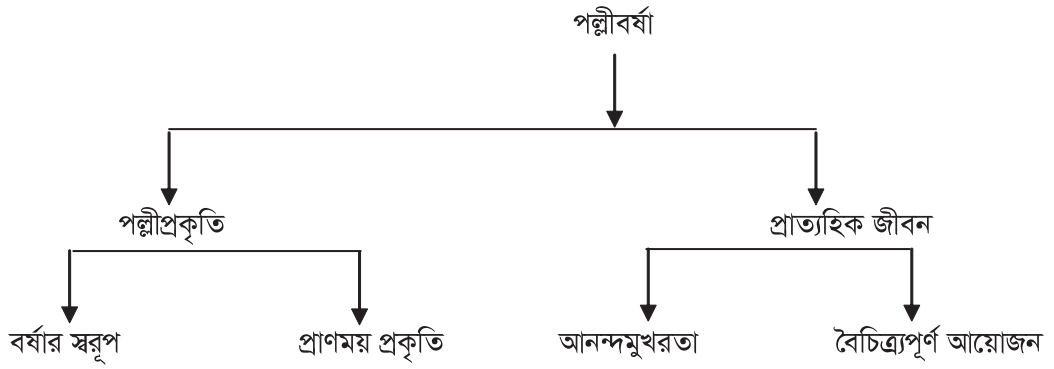
ক. 'পল্লীবর্ষা' কবিতাটি কোন কাব্যগ্রন্থ থেকে নেওয়া হয়েছে?

খ. উদ্দীপকের আলোকে 'পল্লীবর্ষা' কবিতার ভাববস্তু তুলে ধর।

গ. তোমার দেখা পল্লীবর্ষার প্রেক্ষিতে উদ্দীপকের যথার্থতা তুলে ধর।

ঘ. 'পল্লীবর্ষা' কবিতার আলোকে উদ্দীপকটির যথার্থতা বিশ্লেষণ কর।

জয়যাত্রা

আবদুল কাদির

[**কবি-পরিচিতি :** আবদুল কাদির ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দে ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার আশুগঞ্জ থানার আড়াইসিধা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি প্রথমে ব্রাহ্মণবাড়িয়া এবং পরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করেন। প্রথম জীবনে তিনি শিক্ষকতাকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করেন। পরে সরকারের প্রচার ও প্রকাশনা বিভাগের উর্ধ্বতন কর্মকর্তা ছিলেন। এ সময় তিনি 'মাহেনও' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। কবি, সাহিত্য-সমালোচক ও ছান্দসিক হিসেবে তিনি বিশেষভাবে খ্যাত। *দিলরুবা* ও *উত্তর বসন্ত* তাঁর দুটি কাব্যগ্রন্থ। তাঁর সম্পাদিত *কাব্যমালঞ্চ* একখানি বিশিষ্ট সংকলন গ্রন্থ। তিনি *নজরুল রচনাবলি (১ম-৫ম খণ্ড), রোকেয়া রচনাবলি, সিরাজী রচনাবলি* ইত্যাদি সম্পাদনা করেন। *ছন্দ সমীক্ষণ* তাঁর ছন্দবিষয়ক গ্রন্থ। ১৯৮৪ খিষ্টাব্দের ১৯শে ডিসেম্বর কবি আবদুল কাদির মৃত্যুবরণ করেন।]

যাত্রা তব শুরু হোক হে নবীন, কর হানি দ্বারে
নবযুগ ডাকিছে তোমারে।
তোমার উত্থান মাগি, ভবিষ্যৎ রহে প্রতীক্ষায়
রুদ্ধ বাতায়ন-পাশে শঙ্কিত আলোক শিহরায়।
সুপ্তি ত্যাজি বরি লও তারে, লুপ্ত হোক অপমান,
দেখা দিক শাশ্বত কল্যাণ।

সৃজন-উৎসব আজি, হে নবীন, খুলে দাও দ্বার,
আনো তব নব উপহার।
নিখিল-মানব মিলি বিশ্বপ্রান্তে পাতিয়াছে মেলা –
উদ্বোধনী বাণী তার তুমি আসো গাহো এই বেলা।

উদার পরান মেলি সবাকার লহ আলিঙ্গন,
দৃঢ় হোক আত্মার বন্ধন।

ক্রন্দিছে নিখিল বন্দি, হে নবীন, মুক্ত করো তারে
নিয়ে চলো আলো অভিসারে।
পৃথিবীর অধিকারে বঞ্চিত যে ভিক্ষুকের দল –
জীবনের বন্যাবেগে তাহাদের করো বিচঞ্চল।
অসত্য অন্যায় যত ডুবে যাক, সত্যের প্রসাদ
পিয়ে লভ অমৃতের স্বাদ।

অজস্র মৃত্যুরে লঙ্ঘি, হে নবীন, চলো অনায়াসে
মৃত্যুজয়ী জীবন-উল্লাসে।

অনুশীলনমূলক কাজ

উৎস

'জয়যাত্রা' কবিতাটি কবি আবদুল কাদিরের *কবিতাবলি* থেকে সংগৃহীত।

মূলবক্তব্য

নবযুগের উদাত্ত আহ্বানে নবীনকে সাড়া দিতে হবে। মৃত্যুভয়কে তুচ্ছজ্ঞান করে তাকে বিপদসংকুল পথে অগ্রসর হতে হবে। নিপীড়িত ও শোষিত মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠায় তাকে সংগ্রামের পথ বেছে নিতে হবে। এই পথই মানবতার চিরায়ত কল্যাণের পথ। বিশ্বময় নবজাগরণ সূচিত হয়েছে – এ জাগরণের মন্ত্রে এ দেশের নবীন দলকেও উদ্বুদ্ধ হতে হবে। জয় তাদের সুনিশ্চিত।

শব্দার্থ ও টীকা

উত্থান – জাগরণ। **রুদ্ধ** – বন্ধ। **শঙ্কিত** – ভীত। **সুপ্তি** – নিন্দ্রা, ঘুম। **সৃজন-উৎসব** – সৃষ্টির উৎসব, নতুন কিছু করার আয়োজন। **উদ্বোধনী বাণী** – সূচনাকালে যে বাণী বা বক্তব্য প্রদান করা হয়। **আলো অভিসারে** – আলোকের পথে যাত্রা। **মৃত্যুজয়ী** – যা মৃত্যুকে জয় করে।

ভবিষ্যৎ রহে প্রতীক্ষায় – ভবিষ্যৎ প্রতীক্ষমাণ। শোষণ ও বঞ্চনার অবসানে আগামী দিনগুলো সুখী-সুন্দর জীবনের আশ্বাস বহন করবে। নিদ্রামগ্ন জাতিকে নেতৃত্ব দান করবে এ দেশের যুবসমাজ। তারা অভয়মন্ত্রে দীক্ষিত।

শাশ্বত কল্যাণ – চিরায়ত কল্যাণ। পরাধীনতার গ্লানি মোচন করে নবীনকে উজ্জ্বল সম্ভাবনাময় ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে যেতে হবে। এ যাত্রায় জয় সুনিশ্চিত। কারণ এ পথ চিরায়ত কল্যাণের পথ। নিগৃহীত মানবতা নবীনদের অগ্রযাত্রার পথ চেয়ে দিন গুনছে।

দৃঢ় হোক আত্মার বন্ধন – পৃথিবীময় জাগরণের সাড়া পড়েছে। শাসন ও শোষণের শৃঙ্খল ভেঙে পড়েছে। বিশ্বমানবতার মুক্তির এ শুভলগ্নে তরুণ সমাজকেও সাড়া দিতে হবে। বিশ্বমানবতার সঙ্গে তাদের একাত্মতা ঘোষণা করতে হবে। এই আত্মিক বন্ধনই নিপীড়িত মানবসমাজের জন্য বিশ্বময় কল্যাণের পথ নিশ্চিত করবে।

ক্রন্দিছে নিখিল বন্দি – পরাধীনতার নাগপাশে বন্দি মানুষেরা দুঃসহ জীবন যাপন করছে। এ বন্দিদশা থেকে তাদের মুক্ত করতে হবে, অন্ধকার থেকে আলোকের পথে তাদের যাত্রা নিশ্চিত করতে হবে। এ জয়যাত্রায় নেতৃত্ব দান করবে দেশের নবীনেরাই।

ভিক্ষুকের দল – এখানে অধিকার-বঞ্চিত নিগৃহীত মানুষের কথা বলা হয়েছে। নবীনদের মানবতার এ অপমানকে ঘুচিয়ে দিতে হবে। নতুন জীবনের অঙ্গীকারে তাদের উজ্জীবিত করতে হবে।

অনুশীলনী

ক. বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. কার আহ্বানে তারুণ্যশক্তির উদ্বোধন ঘটে?

ক. ভবিষ্যতের　　খ. নবযুগের

গ. শঙ্কিত আলোর　　ঘ. কল্যাণমন্ত্রের

২. ভবিষ্যৎ কার প্রতীক্ষায় থাকে?

ক. আলোর খ. কল্যাণের

গ. নবীনদের ঘ. শক্তির

৩. আমাদের সমাজে শাশ্বত কল্যাণ প্রতিষ্ঠায় কাদের নিঃস্বার্থ ভূমিকা একান্ত প্রয়োজন?

ক. রাজনীতিবিদদের খ. চিন্তাবিদদের

গ. যুবসমাজের ঘ. কৃষক–শ্রমিকদের

খ. সৃজনশীল প্রশ্ন

১. উদ্ধৃত অংশটুকু পড় এবং নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

১৯৭১ বাংলাদেশের ইতিহাসে শাসন ও শোষণের শৃঙ্খল ভেঙে ফেলার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। মুক্তিযুদ্ধের তারুণ্যশক্তি অভয়মন্ত্রে দীক্ষা লাভ করেছিল। নিপীড়িত ও শোষিত মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠায় যে স্বাধীনতা সংগ্রাম–তা-ই চিরায়ত কল্যাণের পথ। নবযুগের উদাত্ত আহ্বানে আত্মোৎসর্গিত এই নবীনপ্রাণ সর্বযুগেই সংগ্রামের পথ বেছে নেয়। জয় তাদের সুনিশ্চিত।

ক. কার আহ্বানে নবীনকে সাড়া দিতে হয়?

খ. কোন লক্ষ্য অর্জনের জন্য নবীনকে উদ্বুদ্ধ হতে হয়?– ব্যাখ্যা কর।

গ. উদ্দীপকের সঙ্গে তোমার পঠিত 'জয়যাত্রা' কবিতার সাদৃশ্যগুলো চিহ্নিত কর।

ঘ. চিরায়ত কল্যাণের পথ কোনটি? এ যাত্রায় নবীনের জয় সুনিশ্চিত হয়ে ওঠে কীভাবে? তোমার মতামত তুলে ধর।

বসন্ত

মাহমুদা খাতুন সিদ্দিকা

[**কবি-পরিচিতি :** মাহমুদা খাতুন সিদ্দিকা ১৯০৬ খ্রিষ্টাব্দের ১৬ই ডিসেম্বর তারিখে পাবনা শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পৈতৃক নিবাস কুষ্টিয়া জেলার নিয়াজতবাড়ি গ্রামে। তাঁর কবিতায় মানুষের সুখ-দুঃখ ও আনন্দ-বেদনার আন্তরিক প্রকাশ ঘটেছে। প্রকৃতির রূপবৈচিত্র্য তাঁর কবিতায় প্রাণের স্পর্শ লাভ করেছে। অত্যন্ত অল্প বয়সে তাঁর কবিপ্রতিভার স্ফুরণ ঘটে এবং বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় তাঁর কবিতা প্রকাশিত হতে থাকে। *পশারিণী, মন ও মৃত্তিকা* এবং *অরণ্যের সুর* তাঁর কাব্যগ্রন্থ। ১৯৭৭ সালের ২রা মে কবি ঢাকায় মৃত্যুবরণ করেন।]

হিম কুহেলির অন্তরতলে আজিকে পুলক জাগে
রাঙিয়া উঠেছে পলাশ কলিকা মধুর রঙিন রাগে
আসিবে এবার ঋতুরাজ বুঝি
তারি বাঁশি ওঠে মলয়েতে বাজি
তাহারি আভাস কাঁপিয়া কাঁপিয়া ওঠে বনতল ঘেরি।
আম্রবাগানে শাখায় শাখায় জাগে নব মঞ্জরি।

উত্তরীয় বায় মাগিছে বিদায় শালবীথিকার পাশে
জাগে কিশলয় সবুজ স্বপনে ঝরা পাতা যায় খসে
শিহরি শিহরি ওঠে সারা তনু
বাজিল কাহার আসিবার বেণু ?
শিশিরের ধারা হয় বুঝি সারা আজি এ সফল ক্ষণে
সার্থক আজি হইবে জীবন বুঝি তার দরশনে।

কঠোর হিমের বিরহী পাথার একাকিনী নিশি জাগি –
গণিয়াছে দিন নিরজনে বসি নয়ন বসনে ঢাকি
চাঁদ জাগিয়াছে মুখ চাহি তার
নিবিড় ব্যথায় ছেয়েছে আঁধার
উতল পবন দিয়ে গেছে দোল ব্যাকুলিয়া সারা মন
নয়নে ঝরেছে বেদনা শিশির নিশি ভরি সারাক্ষণ।

হিম ধরা তার আঁখির আড়ালে কখন ফুটাল ফুল ?
এত কি কুসুম সঞ্চিত ছিল অন্তর বিয়াকুল ?
আশা-চঞ্চল দখিনা মলয়
নিখিল পরানে দোল দিয়া যায়
আসিবে ফাগুন বাজাইবে বেণু বেদনারে যাবে ভুলি
বিকচ কুসুম ঢালিবে গন্ধ, গান গেয়ে যাবে অলি।

আশা নিরাশার দ্বন্দ্ব দোলায় আজিকে ধরণী দোলে
আঁখি মেলি চাহে শিথিল চরণ মলিন আনন তুলে
হরষ ব্যথায় নেয়ে ওঠে মন
রিক্তেরে ভরি দেবে যেই জন
বাঁধন তাহার রহিবে কি হায়! যাবে নাকো কভু ফিরে?
হিমের শেষের শীতের ধরণী শিহরিছে বারে বারে।

কত দিবসের পথ চাওয়া আজি সার্থক হবে বলি
নয়নে বদনে অকথিত কথা উঠিয়াছে উচছলি
দূরে সরে গেছে হিমজর্জর
কুয়াশায় ঢাকা বেদনা নিথর
মর্মরি ওঠে মধুর রাগিণী বন-নিকুঞ্জ তলে
সুন্দর সে যে হাসিতে তাহার নিখিল ভুবন ভোলে।

অনুশীলনমূলক কাজ

উৎস

'বসন্ত' কবিতাটি কবির *পশারিণী* কাব্যগ্রন্থ থেকে সংগৃহীত। ঋতুরাজ বসন্তের আগমনে প্রকৃতির জগতে প্রাণচাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়– এ কবিতায় তা বর্ণিত হয়েছে।

মূলবক্তব্য

শীতের শেষে বসন্ত আসে। বনে বনে নতুন প্রাণের সাড়া জাগে। শাল-পলাশের বনে, আমের শাখায় নতুন মঞ্জরি জাগে। শীতের দিনগুলো যেন বসন্তের অপেক্ষায় দিন গোনে। দখিনা বাতাসে নতুন জীবনের স্পন্দন জাগে আর তারই স্পর্শ পেয়ে অযুত ফুল ফোটে বনে বনে। ফাল্গুন যেন আনন্দের বাঁশি বাজিয়ে মাতিয়ে তোলে চারদিক। শীতের হিমজর্জর কুয়াশায় ঢাকা দিনগুলো আজ অবসিত।

শব্দার্থ ও টীকা

কুহেলি–কুয়াশা। **কলিকা**–ফুলের কলি। **মলয়**–বাতাস। **ঋতুরাজ**–ছয় ঋতুর মধ্যে বসন্তকালকে শ্রেষ্ঠ বিবেচনা করে ঋতুরাজ বলা হয়। **দরশন**–দর্শন, দেখা (কবিতায় দরশন ব্যবহৃত হয়েছে)। **নিরজন**–নির্জন (কবিতায় নিরজন ব্যবহৃত হয়েছে)। **পাথার**–সমুদ্র, বিস্তীর্ণ জলরাশি। **বিয়াকুল**–ব্যাকুল। **নিথর**–নিস্পন্দ, কোনো সাড়া নেই এমন। **নিকুঞ্জ** –বনের লতাপাতায় ঢাকা স্থান। **বিকচ**–বিকশিত।

হিম কুহেলির অন্তরতলে –শীতের দিনে চারদিক কুয়াশায় ঢাকা পড়ে। বসন্তের আভাসে কুয়াশা কাটতে থাকে। কবির দৃষ্টিতে বসন্তের সে আভাসে ঠাণ্ডা কুয়াশার অন্তরে যেন আনন্দের সাড়া জেগেছে।

জাগে কিশলয় সবুজ স্বপনে –বসন্তের আগমনে গাছে গাছে নতুন পাতা জাগে। ধীরে ধীরে চারদিক সবুজে ভরে যায়। কবি সবুজের এ সমারোহকে সবুজ স্বপন বলেছেন।

হিমের বিরহী পাথার–পাথার বলতে সমুদ্র বা বিস্তীর্ণ জলরাশিকে বোঝায়। এখানে শীতকালকে বিরহী পাথার

বলা হয়েছে। শীতের দিনগুলো যেন বসন্তের পথ চেয়ে থাকে, বসন্তের আবির্ভাবে শীতের জড়তা কেটে বনে বনে নতুন প্রাণের সাড়া জাগবে।

নয়নে ঝরছে বেদনা শিশির–কবির দৃষ্টিতে শীতের প্রকৃতি ম্লান ও বিষণ্ণ। শীতের রাতে আকাশ থেকে শিশির ঝরে। এ শিশিরকে কবি প্রকৃতির অশ্রু এবং বেদনার প্রকাশ বলে কল্পনা করেছেন।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. 'রাঙিয়া উঠেছে পলাশ কলিকা মধুর রঙিন রাগে' –কোন কালের আগমনবার্তা শোনা যাচ্ছে ?

ক. বসন্তকাল খ. শীতকাল
গ. গ্রীষ্মকাল ঘ. শরৎকাল

২. "শিহরি শিহরি ওঠে সারা তনু
বাজিল কাহার আসিবার বেণু ?"
-বসন্তের আগমনে কী ধরনের পরিবর্তন সূচিত হয় ?

i. প্রকৃতি ও জীবনে
ii. তরুণ জীবনে
iii. বাঁশির সুরে

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. ii খ. i
গ. ii ও iii ঘ. iii

৩. 'বিকচ কুসুম'–কথাটিতে 'বিকচ' কোন পদের প্রয়োগ ?

ক. বিশেষ্য পদ খ. অব্যয় পদ
গ. বিশেষণ পদ ঘ. ক্রিয়া পদ

৪. 'জাগে কিশলয় সবুজ স্বপনে ঝরা পাতা যায় খসে'–এখানে 'সবুজ স্বপনে' বলতে কী বুঝ ?

ক. কচি পাতা খ. নতুন কুঁড়ি
গ. নতুন স্বপ্ন ঘ. বনে সবুজের সমারোহ

সৃজনশীল প্রশ্ন

নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নের উত্তর দাও।

চাঁদ জাগিয়াছে মুখ চাহি তার
নিবিড় ব্যথায় ছেয়েছে আঁধার
উতল পবন দিয়ে গেছে দোল ব্যাকুলিয়া সারা মন
নয়নে ঝরেছে বেদনা শিশির নিশি ভরি সারাক্ষণ।

ক. চাঁদ কার মুখ চেয়ে আছে ?
খ. 'নিবিড় ব্যথায় ছেয়েছে আঁধার'–কথাটি বুঝিয়ে লিখ।
গ. শীতশেষে বসন্তের আগমনে তোমার অনুভূতি ব্যক্ত কর।
ঘ. 'নয়নে ঝরেছে বেদনা শিশির'–কথাটির তাৎপর্য বিশ্লেষণ কর।

অভিযাত্রিক

সুফিয়া কামাল

[**কবি-পরিচিতি :** সুফিয়া কামাল ১৯১১ খ্রিষ্টাব্দের ২০শে জুন বরিশাল জেলার শায়েস্তাবাদে মামার বাড়িতে জন্মগ্রহণ করেন। মৃত্যু – ২০শে নভেম্বর ১৯৯৯ সালে ঢাকায়। তাঁর পিতার নাম সৈয়দ আবদুল বারী। তিনি কুমিল্লার বাসিন্দা ছিলেন। প্রতিকূল পরিবেশে বসবাস করেও বাংলা ভাষা চর্চায় তিনি ছিলেন গভীর অনুরাগী। ছোটবেলা থেকেই তাঁর কবিতা লেখার হাতেখড়ি হয় এবং তাঁর কবিতা সমসাময়িক পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হতে থাকে। পারিবারিক জীবনের নানা বেদনাদায়ক অভিজ্ঞতা সত্ত্বেও তাঁর কাব্যচর্চা অব্যাহত থাকে। তিনি কিছুকাল কলকাতার একটি বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন। তাঁর কবিতার ভাষা সহজ সরল, ছন্দ সুললিত ও ব্যঞ্জনাময়। তিনি সমাজসেবা ও নারীকল্যাণমূলক নানা কাজের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। এই কর্মের স্বীকৃতির জন্য তাঁকে বাংলাদেশের জনগণ 'জননী সাহসিকা' অভিধায় অভিষিক্ত করেছে। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : *সাঁঝের মায়া, মায়া কাজল, উদাত্ত পৃথিবী, মন ও জীবন, মৃত্তিকার ঘ্রাণ* এবং গল্পগ্রন্থ : *কেয়ার কাঁটা;* স্মৃতিকথামূলক গ্রন্থ : *একাত্তরের ডাইরী* ; শিশুতোষ গ্রন্থ : *ইতল বিতল* ও *নওল কিশোরের দরবারে*।]

দুর্গম পথ পাড়ি দিয়ে যারা দুর্জয়ে করে জয়
তাহাদের পরিচয়
লিখে রাখে মহাকাল,
সব যুগে যুগে সব কালে টিকা ভাস্বরে শোভে ভাল।
সব ক্ষয়ক্ষতি খেয়াল খুশিতে পশ্চাতে যায় ফেলে
বন্ধুর পথ একদা তাদের পদতলে ধরে মেলে
আনন্দ শতদল –
সেই তো জীবন, জয়গৌরবে হেসে ওঠে ঝলমল।

ঝড়ের রাত্রে, বৈশাখী দিনে, বরষার দুর্দিনে
অভিযাত্রিক। নির্ভীক তারা পথ লয় ঠিক চিনে।
হয়তো বা ভুল। তবু ভয় নাই, তরুণের তাজা প্রাণ
পথ হারালেও হার মানে নাকো, করে চলে সন্ধান
অন্য পথের, মুক্ত পথের, সন্ধানী আলো জ্বলে
বিনিদ্র আঁখি তারকার সম, পথে পথে তারা চলে।
প্রাণের শিখার দীপ্তিতে জ্বলে ভাল,
হার মানে মহাকাল।
অনেক পাষাণ, অনেক পাথার, আর কত প্রান্তর
পার হয়ে আসে। মুক্তধারার বারি সম ঝরঝর
নদী হতে চলে, বহে সিন্ধুর পানে
উর্বর করি ঊষরে। দু তীর শ্যামল করিয়া আনে
ফুল-ফসলেতে ভরা;
এই স্বাক্ষর তরুণ প্রাণের অরুণ রক্তক্ষরা।

অনুশীলনমূলক কাজ

উৎস

'অভিযাত্রিক' কবিতাটি কবি সুফিয়া কামালের *স্বনির্বাচিত কবিতা* সংকলন থেকে সংগৃহীত। এই কবিতায় তরুণ অভিযাত্রিকের প্রতি কবির প্রশস্তি ব্যক্ত হয়েছে।

মূলবক্তব্য

দুর্গম পথের দুঃসাহসী অভিযাত্রীদল আমাদের হৃদয়ে চিরভাস্বর। তারা চিরজীবী, মহাকাল তাদের গৌরবোজ্জ্বল কীর্তিকে ধারণ করে। বন্ধুর পথে তারা অগ্রসরমাণ- লক্ষ্য অর্জনে তারা অটল, অবিচল। মুক্তপথের সন্ধানী এই যাত্রীদল অফুরন্ত প্রাণশক্তির অধিকারী। তাদের প্রাণের সেই দীপ্তিমান শিখাই তাদের চলার পথে শক্তিদান করে। নদীর বহমান ধারা যেমন সামনের পথ কেটে চলে, অনুর্বর মাঠ-প্রান্তরকে ফুলে-ফসলে ভরে তোলে, তেমনি তরুণপ্রাণ অভিযাত্রিক সমৃদ্ধ ভবিষ্যৎ নির্মাণের অঙ্গীকার বহন করে। পূর্ব আকাশের রক্তিম সূর্য তাদের প্রাণের ঔজ্জ্বল্যে দীপ্তিমান।

শব্দার্থ ও টীকা

অভিযাত্রিক – দুঃসাহসী পর্যটক। **দুর্গম** – যেখানে সহজে গমন করা যায় না। **দুর্জয়** – যা সহজে জয় করা যায় না। **মহাকাল** – অনন্ত কাল, বহমান সময়। **টিকা** – কপালের ফোঁটা, তিলক। **ভাস্বর** – দ্যুতিময়, আলোকিত, উজ্জ্বল। **শতদল** – পদ্মফুল। **বিনিদ্র** – নিদ্রাহীন, নির্ঘুম। **রক্তক্ষরা** – রক্তক্ষরণ হচ্ছে এমন, রক্তঝরা।

সন্ধানী আলো – অভিযাত্রিক দুর্গম পথের যাত্রী। লক্ষ্য অর্জনে সে অটল, অবিচল। তার সন্ধানী দৃষ্টিতে সম্ভাবনাময় আগামী দিন প্রতিভাত। এই সন্ধানী দৃষ্টির আলোকে অন্ধকার দূরীভুত হয়, আভাসিত হয় সমৃদ্ধ ভবিষ্যৎ।

মুক্তধারার বারি – বহমান নদীর স্রোতোধারা সাগরের পানে এগিয়ে চলে। এগিয়ে চলার পথে সে দুধারের মাঠ-প্রান্তরকে সবুজে ভরে তোলে। তরুণ অভিযাত্রিক তার প্রাণের ঐশ্বর্যে দেশ ও জাতিকে নবজীবন দান করে।

অনুশীলনী

ক. বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. কোন পঙ্ক্তিটির মধ্য দিয়ে কবি অভিযাত্রিকের প্রশস্তি বর্ণনা করেছেন ?
   ক. জয়গৌরবে হেসে ওঠে ঝলমল
   খ. নির্ভীক তারা পথ লয় ঠিক চিনে
   গ. দু তীর শ্যামল করিয়া আনে
   ঘ. নদী হতে চলে, বহে সিন্ধুর পানে

২. 'সব যুগে যুগে সবকালে টিকা ভাস্বরে শোভে ভাল।' এই পঙ্ক্তিতে 'ভাল' অর্থ –
   ক. কপোল   খ. কপাল
   গ. মস্তিষ্ক   ঘ. ভালো

৩. অভিযাত্রিকের গৌরবোজ্জ্বল কীর্তিকে কবি কিসের সঙ্গে তুলনা করেছেন?

ক. নদীর	খ. তারকার

গ. সূর্যের	ঘ. পথের

৪. 'ভাস্বর' শব্দের অর্থ কী?

ক. নিদ্রাহীন	খ. দ্যুতিময়

গ. প্রতিভাত	ঘ. দূরীভূত

খ. সৃজনশীল প্রশ্ন

১. নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

দুর্গম পথের দুঃসাহসী অভিযাত্রিক দল আমাদের হৃদয়ে চিরভাস্বর। তারা চিরজীবী। মহাকাল তাদের গৌরবোজ্জ্বল কীর্তিকে ধারণ করে। বন্ধুর পথে তাদের যাত্রা। লক্ষ্য অর্জনে তারা অটল, অবিচল। মুক্তপথের সন্ধানী এই যাত্রীদল অফুরন্ত প্রাণশক্তির অধিকারী। তাদের প্রাণের সেই দীপ্তিমান শিখাই তাদের চলার পথে শক্তি দান করে। অভিযাত্রিক দলে চলার গতিকে কবি সুফিয়া কামাল বহমান নদীর সঙ্গে তুলনা করেছেন এভাবে :

দু তীর শ্যামল করিয়া আনে
ফুল-ফসলেতে ভরা;
এই স্বাক্ষর তরুণ প্রাণের অরুণ রক্তক্ষরা।

ক. 'মহাকাল' কী?

খ. 'মহাকাল' তাদের গৌরবোজ্জ্বল কীর্তিকে ধারণ করে'- ব্যাখ্যা কর।

গ. তোমার অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌছার জন্য উদ্ধৃতাংশটির চেতনা কীভাবে তোমাকে সহযোগিতা করবে –যৌক্তিক উপস্থাপন কর।

ঘ. 'এই স্বাক্ষর তরুণ প্রাণের অরুণ রক্তক্ষরা'– 'অভিযাত্রিক' কবিতার আলোকে উক্ত পঙ্ক্তির তরুণদের অঙ্গীকার বিশ্লেষণ কর।

পূর্বাশার আলো

আহসান হাবীব

[**কবি-পরিচিতি :** আহসান হাবীব ১৯১৭ খ্রিষ্টাব্দের ২রা জানুয়ারি পিরোজপুর জেলার শঙ্করপাশা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। কর্মজীবনে তিনি সাংবাদিকতাকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করেন। গভীর জীবনবোধ ও আশাবাদ তাঁর কবিতাকে বিশিষ্ট ব্যঞ্জনা দান করেছে। তাঁর কবিতার স্নিগ্ধতা পাঠকচিত্তে এক মধুর আবেশ সৃষ্টি করে। তিনি সামাজিক বৈষম্যের বিরুদ্ধে এবং আর্ত মানবতার সপক্ষে বক্তব্য রেখেছেন। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ *রাত্রিশেষ।* এ ছাড়া *ছায়াহরিণ, সারা দুপুর, আশায় বসতি, মেঘ বলে চৈত্রে যাবো* তাঁর উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ। ছোটদের জন্য তাঁর কবিতার বই *জোছনা রাতের গল্প* ও *ছুটির দিন দুপুরে। রানী খালের সাঁকো* তাঁর কিশোরপাঠ্য উপন্যাস। 'দৈনিক বাংলা' পত্রিকার সাহিত্য সম্পাদক থাকাকালে ১৯৮৫ সালে তাঁর জীবনাবসান ঘটে।]

ওরা এখন পার হতে চায় দুর্গম দীর্ঘ পথ,
শোনো ওরা বলে, রাত শেষ হয়ে এল !
পূর্বাশার আলো ঐ দেখা যায় !

আমরা বলি, আহা অবুঝ ওরা বোঝে না!
ওদের ফিরিয়ে দাও তুমি,
ফিরিয়ে দাও আমাদের বাহুবন্ধনে –
সামনে ওদের কী গভীর অন্ধকার !
ওদের অপরাধ তুমি নিও না।

ওরা বলে, রাত শেষ হয়ে এল আমাদের পেছনে।
আমরা বলি, সামনে তোমাদের রাত নামছে
তোমরা ফিরে এসো।

আশা – সে তো মরীচিকা, আমরা বলি।
ওরা বলে, আশাই জীবন, জীবনের শ্রী।

ওরা এগিয়ে যায় স্বচ্ছন্দে
আমরা অবাক হই।

তুষার শীতল এই অন্ধকার প্রকোষ্ঠে
আমরা একটি ছোট্ট প্রদীপ জ্বালাতে গিয়ে ব্যর্থ হই,
বলি, এই অন্ধকারের দর্শন তোমরা জানো না।

দূরে ওদের কণ্ঠস্বর শোনা যায়;
আলো এত আলো !
এই তো জীবনের দার্শনিক ভাষ্য !

(সংক্ষেপিত)

অনুশীলনমূলক কাজ

উৎস

'পূর্বাশার আলো' কবির *সারা দুপুর* কাব্যগ্রন্থের 'আলো আঁধারের দর্শন' কবিতার অংশবিশেষ।

মূলবক্তব্য

আলোকের অভিযাত্রী দুর্গম পথে এগিয়ে চলে। নতুনের স্বপ্ন ও সম্ভাবনা তাদের চলার পথে প্রেরণা যোগায়। ভীরু কাপুরুষেরা তাদের ভয় দেখিয়ে নিরস্ত করতে চায়। সামনের দীর্ঘ দুর্গম পথ তাদের ভীত-সন্ত্রস্ত করে। তারা বলে, আশা মরীচিকা মাত্র। কিন্তু তবুও অভিযাত্রীদল সামনে এগিয়ে চলে। আশার মধ্যেই তারা জীবনের প্রকৃত অর্থ খুঁজে পায়।

শব্দার্থ ও টীকা

পূর্বাশা – পূর্বদিক। **মরীচিকা** – সূর্যকিরণে মরুভূমিতে জলভ্রান্তি, আশার ছলনা। **প্রকোষ্ঠ** – কক্ষ, কোঠা। **শ্রী** – সৌন্দর্য। **ভাষ্য** – ব্যাখ্যা।

পূর্বাশার আলো – পূর্বদিকে সূর্য ওঠে। ধীরে ধীরে আলোকিত হয় বিশ্বচরাচর। অন্ধকারের অবসানে আলোকের আবির্ভাব প্রকৃতি ও জীবজগৎকে জীবন-চাঞ্চল্যে উদ্দীপিত করে। কবি এর মধ্যে নতুনের স্বপ্ন ও সম্ভাবনা প্রত্যক্ষ করেছেন।

আশাই জীবন – জীবন সংগ্রামশীল। সংগ্রামের মধ্য দিয়েই জীবন নবতর মহিমা লাভ করে। সংগ্রামের পথ দুর্গম ও দুস্তর। কিন্তু আশায় উদ্বুদ্ধ মানুষ তবুও সম্মুখপানে অগ্রসর হয়। সে নতুনের স্বপ্ন দেখে।

জীবনের দার্শনিক ভাষ্য – জীবনের দার্শনিক ব্যাখ্যা। দুর্গম পথের অভিযাত্রী আলোকের মধ্যে জীবনের নবতর অর্থ খুঁজে পায়। জীবনকে তাঁরা মহিমা দান করেন। এখানেই জীবনের গভীরতর অর্থ নিহিত। কবি একেই জীবনের দার্শনিক ভাষ্য বলেছেন।

অনুশীলনী

ক. বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. 'পূর্বাশার আলো' কথাটির সমার্থ কী?

ক. আলোকিত সকাল খ. রৌদ্রোজ্জ্বল দিন
গ. নতুন স্বপ্ন ও সম্ভাবনা ঘ. সমৃদ্ধ জীবন

২. 'আশাই জীবন, জীবনের শ্রী' – কেন?

i. আশার মধ্যে জীবনের প্রকৃত অর্থ খুঁজে পাওয়া যায়
ii. আশায় উদ্দীপ্ত মানুষ সম্মুখপানে অগ্রসর হতে পারে
iii. আশা মানুষের জীবন চাঞ্চল্যে উদ্দীপিত করে

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i খ. i ও iii
গ. iii ঘ. i, ii ও iii

নিচের পঙ্‌ক্তিটি পড় এবং ৩, ৪ ও ৫নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

ওরা বলে, রাত শেষ হয়ে এল আমাদের পেছনে
আমরা বলি, সামনে তোমাদের রাত নামছে
তোমরা ফিরে এসো।

৩. 'তোমরা ফিরে এসো' – এই উক্তিটি কাদের?
ক. ভীত সন্ত্রস্ত দলের খ. কাপুরুষ দলের
গ. নৈরাশ্যবাদী দলের ঘ. বৃদ্ধদের

৪. উদ্ধৃতাংশে 'রাত শেষ হয়ে এল' কথাটির তাৎপর্য কী?
ক. উষার আবির্ভাব খ. আলোর আবির্ভাব
গ. দুর্দিনের পরিসমাপ্তি ঘ. সংগ্রামের পরিসমাপ্তি

৫. 'রাত নামছে'– এই কথাটির তাৎপর্য কী?
ক. গোধূলির সূচনা খ. অন্ধকারের আগমন
গ. দুঃসময়ের সূচনা ঘ. দুর্যোগপূর্ণ সময়

৬. 'পূর্বাশার আলো' কবিতার শিক্ষণীয় বিষয় হল :
ক. আশার উপর নির্ভর করতে হবে খ. সংগ্রামের পথ বেছে নিতে হবে
গ. দুর্গম পথে পাড়ি জমাতে হবে ঘ. অন্ধকারের অবসান ঘটাতে হবে

খ. সৃজনশীল প্রশ্ন

নিচের ছকটি দেখ এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।
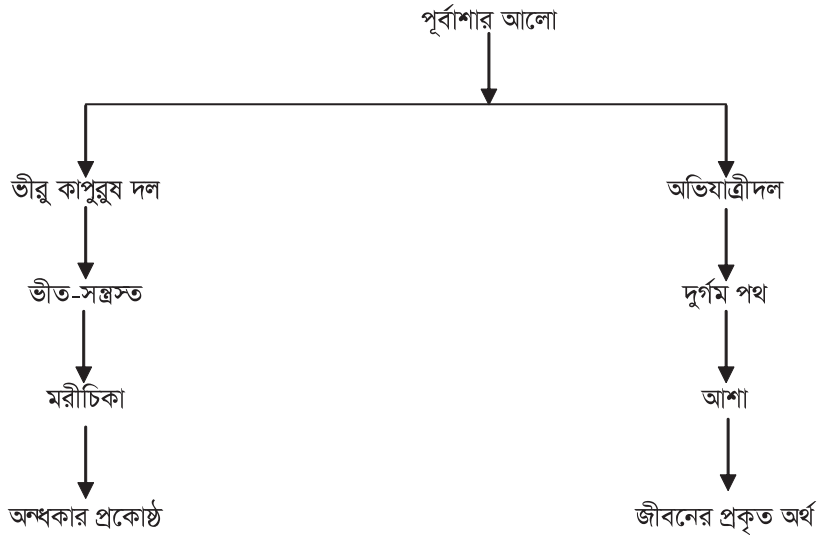
ক. 'পূর্বাশার আলো' কবিতাটি আহসান হাবীবের কোন কবিতার অংশবিশেষ ?
খ. ভীরু কাপুরুষদল 'অন্ধকার প্রকোষ্ঠে' পড়ে থাকে কেন?–ব্যাখ্যা কর।
গ. 'পূর্বাশার আলো' কবিতায় ভীরু কাপুরুষদল ও অভিযাত্রীদল-এর জীবনচিত্র অঙ্কনে উপরের ছকটি কতটুকু সংগতিপূর্ণ – আলোচনা কর।
ঘ. উদ্দীপকের ছকটি থেকে 'পূর্বাশার আলো' কবিতায় জীবনের বিপরীতার্থক দুই অধ্যায়ের স্বরূপ বিশ্লেষণ কর।

সাত সাগরের মাঝি

ফররুখ আহমদ

[**কবি-পরিচিতি :** ফররুখ আহমদ ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দের ১০ই জুন যশোর জেলার মাঝআইল গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কলকাতা রিপন কলেজ থেকে আই. এ.পাস করেন এবং কলকাতার স্কটিশ চার্চ কলেজে দর্শনে অনার্স ও সেন্টপল কলেজে ইংরেজিতে অনার্সের ছাত্র ছিলেন। কর্মজীবনে তিনি নানা পদে নিয়োজিত হন এবং ১৯৪৭ থেকে ১৯৭২ সাল পর্যন্ত তিনি ঢাকা বেতারে স্টাফ রাইটার পদে নিয়োজিত ছিলেন। ইসলামি আদর্শ ও ঐতিহ্য তাঁকে কাব্যসৃষ্টিতে প্রেরণা যুগিয়েছে। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : *সাত সাগরের মাঝি, সিরাজাম্ মুনীরা, নৌফেল ও হাতেম, মুহূর্তের কবিতা, পাখির বাসা, হাতেম তায়ী, নতুন লেখা, হরফের ছড়া, ছড়ার আসর* ইত্যাদি। ১৯৭৪ সালের ১৯শে অক্টোবর তিনি পরলোকগমন করেন।]

কত যে আঁধার পর্দা পারায়ে ভোর হল জানি না তা।
নারঙ্গি বনে কাঁপছে সবুজ পাতা।
দুয়ারে তোমার সাত সাগরের জোয়ার এনেছে ফেনা।
তবু জাগলে না? তবু, তুমি জাগলে না?
সাত সাগরের মাঝি চেয়ে দেখো দুয়ারে ডাকে জাহাজ,
অচল ছবি সে, তসবির যেন দাঁড়ায়ে রয়েছে আজ।
হালে পানি নাই, পাল তার ওড়ে নাকো,
হে নাবিক! তুমি মিনতি আমার রাখো;
তুমি উঠে এসো, তুমি উঠে এসো মাঝিমাল্লার দলে
দেখবে তোমার কিশতি আবার ভেসেছে সাগর জলে,
নীল দরিয়ায় যেন সে পূর্ণ চাঁদ
মেঘ তরঙ্গ কেটে কেটে চলে ভেঙে চলে সব বাঁধ।
তবু তুমি জাগো, কখন সকালে ঝরেছে হাসনাহেনা
এখনো তোমার ঘুম ভাঙলো না? তবু, তুমি জাগলে না?
দুয়ারে সাপের গর্জন শোনো নাকি?
কত অসংখ্য ক্ষুধিতের সেথা ভিড়,
হে মাঝি! তোমার বেসাতি ছড়াও, শোনো,
নইলে যে-সব ভেঙে হবে চৌচির।

তুমি দেখছ না, এরা চলে কোন আলেয়ার পিছে পিছে?
চলে ক্রমাগত পথ ছেড়ে আরও নিচে!
হে মাঝি! তোমার সেতারা নেভেনি একথা জানো তো তুমি,
তোমার চাঁদনি রাতের স্বপ্ন দেখেছে এ মরুভূমি,

দেখো জমা হল লালা রায়হান তোমার দিগন্তরে;
তবু কেন তুমি ভয় পাও, কেন কাঁপো অজ্ঞাত ডরে!
তোমার জাহাজ হয়েছে কি বানচাল,
মেঘ কি তোমার সেতারা করে আড়াল?
তাই কি অচল জাহাজের ভাঙা হাল
তাই কি কাঁপছে সমুদ্র ক্ষুধাতুর
বাতাস কাঁপানো তোমার ও ফাঁকা পাল?
জানি না, তবুও ডাকছি তোমাকে সাত দরিয়ার মাঝি,
প্রবাল দ্বীপের নারিকেল শাখা বাতাসে উঠেছে বাজি?

এ ঘুমে তোমার মাঝিমাল্লার ধৈর্য নেইকো আর,
সাত সমুদ্র নীল আকাশে তোলে বিষ ফেনভার,
এদিকে অচেনা যাত্রী চলেছে আকাশের পথ ধরে
নারঙ্গি বনে কাঁপছে সবুজ পাতা।
বেসাতি তোমার পূর্ণ করে কে মারজানে মর্মরে?
ঘুমঘোরে তুমি শুনছ কেবল দুঃস্বপ্নের গাঁথা।

উচ্ছৃঙ্খল রাত্রির আজো মেটেনি কি সব দেনা?
সকাল হয়েছে। তবু জাগলে না? তবু তুমি জাগলে না?
তুমি কি ভুলেছ লবঙ্গ ফুল, এলাচের মৌসুমী,
যেখানে ধূলিতে কাঁকরে দিনের জাফরান খোলে কলি,
যেখানে মুগ্ধ ইয়াসমিনের শুভ্র ললাট চুমি
পরীর দেশের স্বপ্ন সেহেলি জাগে গুলে বকাওলি?
ভুলেছ কি সেই প্রথম সফর জাহাজ চলেছে ভেসে
অজানা ফুলের দেশে,
ভুলেছ কি সেই জমরুদ তোলা স্বপ্ন সবার চোখে
ঝলসে চন্দ্রালোকে,
পাল তুলে কোথা জাহাজ চলেছে কেটে কেটে নোনা পানি,
অশ্রান্ত সন্ধানী।

অনুশীলনমূলক কাজ

উৎস

ফররুখ আহমদের 'সাত সাগরের মাঝি' কবিতাটি তাঁর *সাত সাগরের মাঝি* কাব্যগ্রন্থের প্রথমাংশ থেকে চয়ন করা হয়েছে।

মূলবক্তব্য

এটি একটি প্রতীকী কবিতা। জাতীয় জীবনের দুর্দিনে সংকট উত্তরণের জন্য সাত সাগরের মাঝি তথা জাতির কর্ণধারকে দূর বন্দরে যাত্রা করার আহ্বান জানানো হয়েছে। জাতীয় জীবনে নতুন জাগরণ এসেছে, এবার সুযোগ্য কর্ণধার জাতিকে নতুন জীবনের বন্দরে পৌঁছে দেবেন। সাত সাগরের কৃতী মাঝির কর্মতৎপরতার ওপরই জাতির ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা নিহিত। তাঁকে অতীতের ঐতিহ্যের কথা স্মরণ করে ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার পথে অগ্রসর হতে হবে। এই কবিতায় জাতির কর্ণধারের উদ্দেশ্যে জাতির উন্নতি সাধনের ব্রত গ্রহণ করার জন্য আহ্বান জানানো হয়েছে।

শব্দার্থ ও টীকা

নারজ্গি–কমলালেবু। **তসবির**–ছবি। **কিশতি**–নৌকা, জাহাজ। **দরিয়া**–সাগর। **তরজ্গ**–ঢেউ। **বেসাতি**–মালপত্র। **চৌচির**–চারভাগে খণ্ড খণ্ড। **আলেয়া**–রাতে জলাভূমিতে যে আলো জ্বলতে দেখা যায়, গ্যাসবিশেষ। **প্রহেলিকা**–বিভ্রান্তিকর বস্তু। **অজ্ঞাত**–অজানা। **ক্ষুধাতুর**–ক্ষুধার্ত। **আক্রোশে**–রাগে, ক্ষোভে। **সফর**–ভ্রমণ। **মারজান**–মূল্যবান পাথর। **ইয়াসমিন**–জুঁইফুল। **জমরুদ**–সবুজ পাথর বিশেষ, পান্না পাথর। **সেহেলি**–খেলার সাথি, বান্ধবী।

অনুশীলনী

ক. বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. 'সাত সাগরের মাঝি' কবিতার মূল প্রতিপাদ্য বিষয়?

ক. জাতীয় জাগরণের বর্ণনা   খ. ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার ইঙ্গিত
গ. জাতীয় নেতাকে আহ্বান   ঘ. অতীত ঐতিহ্যের বর্ণনা

২. 'নীল দরিয়ার যেন সে পূর্ণ চাঁদ' –পঙ্ক্তিটিতে 'পূর্ণচাঁদ' হল :

ক. জাহাজ   খ. সেতারা
গ. কর্ণধার   ঘ. মাঝিমাল্লা

৩. 'সেতারা' বলতে কবি কী বুঝিয়েছেন?

i. পথ নির্দেশক তারা   ii. জাতীয় ঐতিহ্যের চিহ্ন
iii. নব জাগরণ

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i   খ. i ও ii
গ. i ও iii   ঘ. ii ও iii

৪. 'উচ্ছৃঙ্খল রাত্রি' বলতে কবি বুঝিয়েছেন –

ক.	সংকটাপন্ন জাতি	খ.	দুঃসময়ের অস্থিরতা
গ.	সংকটময় সময়	ঘ.	সামাজিক বিশৃঙ্খলা

খ. সৃজনশীল প্রশ্ন

১. উদ্ধৃত অংশটুকু পড় এবং নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

হে নাবিক ! তুমি মিনতি আমার রাখো;
তুমি উঠে এসো, তুমি উঠে এসো মাঝিমাল্লার দলে
দেখবে তোমার কিশতি আবার ভেসেছে সাগর জলে,
নীল দরিয়ায় যেন সে পূর্ণ চাঁদ
মেঘ তরঙ্গ কেটে কেটে চলে ভেঙে চলে সব বাঁধ।

ক. কবিতাংশটি ফররুখ আহমদের কোন কাব্যগ্রন্থ থেকে নেওয়া হয়েছে?

খ. উদ্ধৃতাংশে ব্যবহৃত মাঝিমাল্লাদের স্বরূপ ব্যাখ্যা কর।

গ. কোন কোন বৈশিষ্ট্যের আলোকে উদ্ধৃতির কবিতাংশটুকুকে রূপক কবিতা বলা যায়–আলোচনা কর।

ঘ. 'নীল দরিয়ায় যেন সে পূর্ণ চাঁদ/মেঘ তরঙ্গ কেটে কেটে চলে ভেঙে চলে সব বাঁধ।'– জাতীয় ক্রান্তিলগ্নে নেতৃত্বের ভূমিকা উদ্ধৃতাংশে কীভাবে প্রতিফলিত হয়েছে তা বিশ্লেষণ কর।

ফেরা

সৈয়দ আলী আহসান

[**কবি-পরিচিতি** : সৈয়দ আলী আহসান মাগুরা জেলার আলোকদিয়ায় ১৯২২ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৯৪৪ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজি সাহিত্যে এম.এ.ডিগ্রি লাভ করেন। তদানীন্তন অল ইন্ডিয়া রেডিওর কর্মকর্তা হিসেবে তাঁর কর্মজীবন শুরু হয়। পরে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে প্রভাষক হিসেবে যোগদান করেন। এছাড়া পর্যায়ক্রমে তিনি করাচি বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রধান, বাংলা একাডেমীর পরিচালক, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর, জাহাঙ্গীরনগর ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য এবং বাংলাদেশ সরকারের শিক্ষা-উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তাঁর রচনায় ঐতিহ্যচেতনা, সৌন্দর্যবোধ ও দেশপ্রীতির সমন্বয় ঘটেছে। তাঁর উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ : *অনেক আকাশ, একক সন্ধ্যায় বসন্ত, সহসা সচকিত, আমার প্রতিদিনের শব্দ;* অনুবাদ: *হুইটম্যানের কবিতা, মেরিডিথের কবিতা;* সমালোচনা গ্রন্থ: *কবি মধুসূদন, নজরুল ইসলাম, আধুনিক বাংলা কবিতা: শব্দের অনুষঙ্গে* ইত্যাদি। তিনি ২৫শে জুলাই ২০০২ সালে মৃত্যুবরণ করেন।]

অবশেষে ফিরে এলাম।
পথহীন ঘন অরণ্যের মধ্যে হেঁটেছি
এবং সুদীর্ঘ আবর্তিত পথে–
সুদীর্ঘ চরণচিহ্নহীন পথে।

এবং এখানে আমি গল্প বলছি–
কোথায় ছিলাম,
এবং কেন,
এবং কী অবস্থায়?
যখন বাতাসের মধ্যে ঘুরে দাঁড়াই
একটা সাড়া কানে বাজে-
পরিত্যক্ত সময়ের সাড়া
যখন আমার পৃথিবী ধুলো হয়েছিল
এবং অনির্বাণ আগুন,
গাছ থেকে আলো সরে গিয়েছিল
এবং অনেক মৃত মানুষ ছিল নদীতে
এবং বনভূমিতে–
এবং আরও অনেক মানুষ শুধু হাঁটছিল
অনবরত হাঁটছিল।
অবশেষে ফিরে এলাম।

একটি নতুন হৃদয় পেয়েছি
জীবনের কোমল কম্পনকে ধরে রাখবার জন্য,
এখানে যদিও কেউ নেই–

তুমি নেই অথবা অন্য কেউ,
কিন্তু আমার সব কিছু আছে-
সময়ের অনেক গভীরে ডুব দিয়ে
আমি আমার স্বদেশকে পেয়েছি।

(সংক্ষেপিত)

অনুশীলনমূলক কাজ

উৎস

সৈয়দ আলী আহসানের 'ফেরা' কবিতাটি *আমার প্রতিদিনের শব্দ* কাব্যগ্রন্থ থেকে গৃহীত। কবিতাটির মূল নাম 'অবশেষে ফিরে এলাম'।

মূলবক্তব্য

এই কবিতায় প্রবাসযাপন থেকে স্বদেশে ফিরে আসবার অভিজ্ঞতার কথা বর্ণনা করা হয়েছে। কবি ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধে যোগদানের উদ্দেশ্যে দেশত্যাগ করেছিলেন। এ সময় তাঁকে পাড়ি দিতে হয়েছে দীর্ঘপথ। তিনি দেখেছেন নদীতে, বনভূমিতে মানুষের অসংখ্য লাশ। মানুষ নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে পাড়ি দিচ্ছে দীর্ঘপথ। কিন্তু বিনিময়ে পেয়েছেন স্বাধীন বাংলাদেশ, যা তিনি হৃদয়ে ধারণ করেছেন।

শব্দার্থ ও টীকা

আবর্তিত – ঘূর্ণমান, চক্রাকারে ভ্রমণরত। **চরণচিহ্নহীন** – জনশূন্য, যেখানে মানুষের পা পড়েনি। **পরিত্যক্ত** – যা বর্জন করা হয়েছে। **অনির্বাণ** – যা কখনও নেভে না। **অনবরত** - সতত, সবসময়।

একটি নতুন হৃদয় পেয়েছি – একটি নতুন হৃদয় বলতে কবি তাঁর প্রিয় স্বদেশ স্বাধীন বাংলাদেশকে বুঝিয়েছেন। হৃৎস্পন্দন যেমন জীবনের অস্তিত্ব ঘোষণা করে তেমনি একটি স্বাধীন দেশের অধিকারী হিসেবে নতুন করে কবি নিজের অস্তিত্ব উপলব্ধি করছেন।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. 'ফেরা' কবিতাটির বিষয়বস্তুর আলোকে কবিতাটি অন্য কোন নামে মানানসই হতো বলে মনে কর ?

ক. পরিত্যক্ত সময় খ. সময়ের প্রয়োজনে

গ. অবশেষে ফিরে এলাম ঘ. প্রতীক্ষিত স্বদেশ

২. কবি কোনটিকে আমাদের অস্তিত্বের স্মারক বলে মনে করেন ?

ক. স্বদেশকে ফিরে পাওয়া খ. স্বাধীন স্বদেশ ভূমি

গ. নতুন জীবন পাওয়া ঘ. বীরযোদ্ধাদের আত্মত্যাগ

নিচের স্তবকটি পড়ে ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও।

'একটি নতুন হৃদয় পেয়েছি
জীবনের কোমল কম্পনকে ধরে রাখবার জন্য,
এখানে যদিও কেউ নেই।'

৩. 'জীবনের কোমল কম্পন'-এর অভিধানিক অর্থ কী ?

ক. বেঁচে থাকা খ. হৃদকম্পন

গ. ছন্দময় জীবন ঘ. জীবনসংগ্রাম

৪ 'একটি নতুন হৃদয় পেয়েছি'–এ কথাটি কোন তাৎপর্য বহন করে ?

ক. স্বদেশের সৌন্দর্যকে নতুনভাবে উপভোগ

খ. সদ্য স্বাধীন হওয়া স্বদেশভূমি

গ. বিদ্রোহী চেতনাসমেত গণজাগরণ

ঘ. অধিকার আদায়ে গণমানুষের সংগ্রাম

সৃজনশীল প্রশ্ন

স্তবকটি পড়ে নিচের প্রশ্নসমূহের উত্তর দাও।

তুমি নেই অথবা অন্য কেউ,
কিন্তু আমার সব কিছু আছে-
সময়ের অনেক গভীরে ডুব দিয়ে
আমি আমার স্বদেশকে পেয়েছি।

ক. উদ্দীপকটিতে কোন সময়ের কথা বলা হয়েছে ?

খ. 'সময়ের অনেক গভীরে' বলতে কী বোঝানো হয়েছে ?

গ. উদ্দীপকের আলোকে 'ফেরা' কবিতার নামকরণের সার্থকতা নিরূপণ কর।

ঘ. 'আমি আমার স্বদেশকে ফিরে পেয়েছি।'–এ মন্তব্যের আলোকে কবির স্বদেশের স্বরূপ বিশ্লেষণ কর।

এইসব গ্রামে

আবুল হোসেন

[**কবি-পরিচিতি :** আবুল হোসেন ১৯২২ খ্রিষ্টাব্দে খুলনা জেলার রূপসা থানার দেয়াড়া বেলফলিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কলকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে অর্থনীতি বিষয়ে বি. এ. সম্মান ও এম. এ. ডিগ্রি লাভ করেন। তিনি বাংলাদেশ সরকারের যুগ্মসচিব পদ থেকে অবসর গ্রহণ করে ঢাকায় বসবাস করছেন। তাঁর কবিতায় দেশের প্রতি গভীর মমত্ববোধের স্বচ্ছন্দ প্রকাশ ঘটেছে। চিত্রময়তা ও শব্দের প্রয়োগকুশলতা তাঁর কবিতাকে বিশিষ্টতা দান করেছে। তাঁর উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ হচ্ছে – *নববসন্ত, বিরস সংলাপ, হাওয়া তোমার কী দুঃসাহস, দুঃস্বপ্ন থেকে দুঃস্বপ্ন* ইত্যাদি। *ইকবালের কবিতা, বিভিন্ন ভাষার কবিতা, অন্য ক্ষেতের ফসল* ইত্যাদি তাঁর অনুবাদ কাব্যগ্রন্থ।]

শেষ রাতে শুরু বর্ষার মাতম থামল এইমাত্র,
রুপালি ঝর্ণার মতো চিকচিকে সকাল
নামছে আকাশের গা বেয়ে।
কাল-রাতে-আসা এই গ্রামে
আজকে সকালে পলক পড়ে না চোখে।

এখন মেখে আছে মনে
শেষ রাতে জলের সুরে বাঁশপাতার গান
ভেসে আসছে জানলা দিয়ে,
যা আমরা খুলিনি কখনো হিম হাওয়ার ভয়ে,
কোন দূর দক্ষিণ থেকে যে হাওয়া বয়ে আনল
পাকা ফসলের গন্ধ সবুজ ধানের ক্ষেতে
যে ক্ষেত আমরা দেখিনি কোনোদিন।

জল ছল ছল করে আড়া ভেঙে,
ভাসানো পুকুর থেকে কইমাছ ওঠে
কান বেয়ে হেঁটে যায় জলভরা মাঠে,
তুমি না জানলেও এ তল্লাটে সবাই যা জানে
ছেলেবেলা থেকে।

হয়তো সন্ধ্যায় ডেকে উঠবে শিয়ালের পাল
ভূতের মতন অন্ধকারে,
সকালের এই ঝকঝকে বন
তখন যেন রাশি রাশি প্রেত,
চোখ নেই মুখ নেই তাদের কী নিঃশব্দ সংকেত পরস্পরে
কাল-রাতে দেখেছি যা আসার পথে
নদীর কিনারা দিয়ে শিরশিরে হাওয়ায়
পায় পায় যারা এসে শরীর কাঁপায়

তারপর মিশে যায় কখন হঠাৎ এক লণ্ঠনের আলোয়,
সামনে একটু দূরে, তবু মনে হয়
যেন কত কাল থেকে আসছে সে আলো।

আজকে সকালে এই গ্রাম দেখে পলক পড়ে না চোখে।
নদীর কিনারে, ঘন বনের ধারে, অমাবস্যার দিঘির পাড়ে.
আম জাম কাঁঠালের মিনারে মিনারে.
ধানক্ষেত ঘেরা সীমানাহীন মাঠে মাঠে
এই সব ছোট ছোট গ্রাম,
আমার দেশের নাম খোদা তার সোনার ফলকে।
আমার সোনার দেশ
সোনা হল এই সব গ্রামে গ্রামে।

অনুশীলনমূলক কাজ

উৎস

'এইসব গ্রামে' কবির *নববসন্ত* কাব্য থেকে নেওয়া হয়েছে। এই কবিতায় কবি গ্রামের সুন্দর টুকরো ছবি এঁকেছেন।

মূলবক্তব্য

রাতের অবিশ্রান্ত বর্ষণ-শেষে গ্রামে রুপালি সকাল দৃষ্টিকে আনন্দিত করে। রাতে বৃষ্টির অঝোর ধারায় বাঁশপাতায় গানের সুর বেজেছে। দখিনা বাতাসে পাকা ধানের গন্ধ ভেসে এসেছে। বৃষ্টির পানিতে কানায় কানায় ভরে ওঠা পুকুর থেকে কইমাছ কানে হেঁটে দূরের জলভরা মাঠে উঠে আসে। ভূতুড়ে অন্ধকারে ডেকে ওঠে শেয়াল আর সে অন্ধকারে ঝোপঝাড়কে রাশি রাশি প্রেতের মতো মনে হয়। কিন্তু সকালের ঝকঝকে আলোয় গ্রাম আশ্চর্য সুন্দর হয়ে ওঠে। নদীর কিনারে, বনের ধারে, দিঘির পাড়ে, আম-জাম-কাঁঠালের বনে আমার সোনার দেশের সোনার গ্রামগুলো ছবি হয়ে আছে।

শব্দার্থ ও টীকা

মাতম – শোক, মহররমের সময় বুক চাপড়ে যে শোক প্রকাশ করা হয়। **হিম** – ঠাণ্ডা, শীতল। **তল্লাট** – এলাকা, অঞ্চল, স্থান। **পলক** – নিমেষ, চোখের পাতা ফেলতে যতক্ষণ সময় লাগে। **মিনার** – চূড়া। **ফলক** –ফলা, চওড়া কাঠ, যার গায়ে পরিচয় লেখা হয়। **বর্ষার মাতম**– কবি এখানে বর্ষার অবিশ্রান্ত বর্ষণের শব্দকে বুঝিয়েছেন। বর্ষার দিনে আকাশ থেকে অবিরাম জলধারা ঝরে। আর তাতে যে সুর ওঠে, কবির কাছে তা শোকের বিলাপের মতো শোনায়। **সংকেত** – ইঙ্গিত, ইশারা।

বাঁশপাতার গান – বাঁশবনে অঝোর ধারায় বৃষ্টি পড়ে। বাঁশের পাতায় পাতায় বৃষ্টি পড়ে যে মধুর সুর বাজে, কবি তাকে বাঁশপাতার গান বলেছেন।
ভাসানো পুকুর – বর্ষার অবিরাম বৃষ্টিধারায় পুকুরের কানায় কানায় পানি ছাপিয়ে ওঠে। পাড়- ডুবে-যাওয়া পুকুরকে ভাসানো পুকুর বলা হয়েছে।
আম জাম কাঁঠালের মিনারে মিনারে – গ্রামের এখানে-সেখানে আম-জাম-কাঁঠালের বন আকাশে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। এ উঁচু বনকে কবি মিনার বলেছেন।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. 'বাঁশপাতার গান' বলতে কবিতায় বোঝানো হয়েছে

ক. বাঁশঝাড়ে পাতার শব্দ
খ. বাঁশঝাড়ে বৃষ্টি পড়ার শব্দ
গ. বাঁশগুলোর পারস্পরিক ঘর্ষণের শব্দ
ঘ. বাঁশবনে ঝড়ো বাতাসের শব্দ

২. পানিপূর্ণ ঘাটে হেঁটে যায়-

ক. কৃষক
খ. শিয়াল
গ. হর্ষক্ষ
ঘ. কই মাছ

নিচের পঙ্‌ক্তিগুলো পড় এবং ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও।

তারপর, মিশে যায় কখন হঠাৎ এক লণ্ঠনের আলোয়
সামনে একটু দূরে, তবু মনে হয়
যেন কত কাল থেকে আসছে সে আলো।

উদ্ধৃতাংশে কোন সময়ের কথা বলা হয়েছে ?

ক. সকালবেলার
খ. সন্ধ্যাকালের
গ. জোৎস্নারাত্রির
ঘ. সারাদিনের

৪. উদ্ধৃতাংশটুকু কোন কবিতার অংশ ?

ক. তোমাকে অভিবাদন বাংলাদেশ
খ. সাত সাগরের মাঝি
গ. তিতাস
ঘ. এইসব গ্রামে

সৃজনশীল প্রশ্ন

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

রাত্রির অঝোর বৃষ্টি, রূপালি সকাল, বাঁশপাতার গানের সুর, পাকাধানের গাছ, পুকুর থেকে উঠে আসা কইমাছ, ভুতুড়ে অন্ধকার রাতে শেয়ালের ডাক–এ সবই আমাদের গ্রামীণ জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। রাতের পর যখন সকাল নেমে আসে তখন নতুন সূর্যের আলোতে ঝলমল করে উঠে সারা গাঁও। নদীর তীর, বনবাদাড় ছবি হয়ে ধরা দেয়।

ক. উদ্ধৃতাংশে কিসের বর্ণনা দেয়া হয়েছে ?
খ. নতুন সূর্য বলতে কী বোঝানো হয়েছে বর্ণনা কর।
গ. উদ্ধৃতাংশটুকু তোমার পঠিত কোন কবিতার সঙ্গে সম্পর্কিত ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে লিখ।
ঘ. "রাতের পর যখন সকাল নেমে আসে তখন নতুন সূর্যের আলোতে ঝলমল করে উঠে সারা গাঁও"-কথাটির তাৎপর্য বিশ্লেষণ কর।

দুর্মর

সুকান্ত ভট্টাচার্য

[**কবি-পরিচিতি :** সুকান্ত ভট্টাচার্য ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দে কলকাতার কালীঘাটে জন্মগ্রহণ করেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে বিশ্বব্যাপী ধ্বংস ও মৃত্যুর তাণ্ডবলীলা কিশোর সুকান্তকে দারুণভাবে স্পর্শ করে। এছাড়া সামাজিক নানা অনাচার ও বৈষম্য তাঁকে প্রবলভাবে আলোড়িত করে। তাঁর কবিতায় এই অনাচার ও বৈষম্যের বিরুদ্ধে ধ্বনিত প্রবল প্রতিবাদ আমাদের সচকিত করে। নিপীড়িত গণমানুষের প্রতি গভীর মমতার প্রকাশ ঘটেছে তাঁর কবিতায়। তাঁর কাব্যগ্রন্থ : *ছাড়পত্র, ঘুম নেই, পূর্বাভাস, অভিযান, হরতাল* ইত্যাদি। ১৯৪৭ সালে মাত্র একুশ বছর বয়সে কবি মৃত্যুবরণ করেন।]

হিমালয় থেকে সুন্দরবন, হঠাৎ বাংলাদেশ
কেঁপে কেঁপে ওঠে পদ্মার উচ্ছ্বাসে,
সে কোলাহলের রুদ্ধস্বরের আমি পাই উদ্দেশ।
জলে ও মাটিতে ভাঙনের বেগ আসে।

হঠাৎ নিরীহ মাটিতে কখন
জন্ম নিয়েছে সচেতনতার ধান,
গত আকালের মৃত্যুকে মুছে
আবার এসেছে বাংলাদেশের প্রাণ।

হয় ধান নয় প্রাণ–এ শব্দে
সারা দেশ দিশাহারা
একবার মরে ভুলে গেছে আজ
মৃত্যুর ভয় তারা।
শাবাশ বাংলাদেশ, এ পৃথিবী
অবাক তাকিয়ে রয়;
জ্বলে-পুড়ে-মরে ছারখার
তবু মাথা নোয়াবার নয়।

এবার লোকের ঘরে ঘরে যাবে
সোনালি নয়কো, রক্ত রঙিন ধান
দেখবে সকলে সেখানে জ্বলছে
দাউ দাউ করে বাংলাদেশের প্রাণ।

অনুশীলনমূলক কাজ

উৎস

'দুর্মর' কবিতাটি কবির *পূর্বাভাস* কাব্যগ্রন্থ থেকে সংকলিত হয়েছে।

মূলবক্তব্য

সমগ্র বাংলাদেশ আজ জাগ্রত। ধ্বংস ও মৃত্যুর মধ্য দিয়ে এদেশে নতুন প্রাণের জাগরণ ঘটেছে। এ দেশের জাগ্রত জনতা আজ আর মৃত্যুভয়ে শঙ্কিত নয়। শোষণ ও শাসনে নিপীড়িত মানুষ তার ন্যায্য অধিকার আদায় করে নিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। সারা বিশ্ব আজ বাংলাদেশের নবজাগৃতিকে অভিনন্দিত করছে। এ দেশে গণমানুষ এ সত্যকে প্রতিষ্ঠা করেছে যে, জ্বলে পুড়ে মরে ছারখার হলেও তারা অত্যাচারী শাসকের কাছে মাথা নত করবে না।

শব্দার্থ ও টীকা

দুর্মর – যা সহজে মরে না, কঠিন প্রাণ। **উচ্ছ্বাস** – প্রবল ভাবাবেগ। **উদ্দেশ** – সন্ধান, খোঁজ।

সচেতনতার ধান – এ দেশের মানুষ নিরীহ ও নম্র বলে পরিচিত। সেই নিরীহ মানুষ অকস্মাৎ সচেতন হয়ে জেগে উঠেছে। তাদের মধ্যে নতুন প্রাণের সঞ্চার হয়েছে। কবি এ নবজাগরণকে 'সচেতনতার ধান' বলে অভিহিত করেছেন। মাঠে মাঠে নতুন ধান যেমন এ দেশের মানুষের ঘরে ঘরে আনন্দের জোয়ার সৃষ্টি করে, ঠিক তেমনি মৃত্যু ও ধ্বংসের মধ্যে দিয়ে এ দেশের মানুষ নতুন করে জেগে উঠেছে। তারা আজ অধিকারসচেতন।

হয় ধান নয় প্রাণ – অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে এ দেশের গণমানুষ আজ রুখে দাঁড়িয়েছে। তারা নিজেদের ন্যায্য অধিকার আদায় করে নেবে। খেতের ফসলের অধিকার এ দেশের চাষির; জোতদার ভূস্বামীর নয়। ফসলের অধিকার আদায়ে তারা প্রাণ দেবে, তবু ফসল দেবে না।

অনুশীলনী

ক. বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য কত বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন?
   - ক. একুশ
   - খ. তেইশ
   - গ. সাতাশ
   - ঘ. ঊনত্রিশ

২. দুর্মর কবিতায় 'কোলাহলের রুদ্ধস্বর' বলতে কী বোঝানো হয়েছে?
   - ক. মুখর কণ্ঠস্বর
   - খ. জলোচ্ছ্বাস
   - গ. রুদ্ধ কোলাহল
   - ঘ. জাগরণ

৩. 'চির উন্নত মম শির'–উদ্ধৃতিটির মর্মার্থ 'দুর্মর' কবিতার কোন চরণে ফুটে উঠেছে?
   - ক. একবার মরে ভুলে গেছে আজ/মৃত্যুর ভয় তারা।
   - খ. গত আকালের মৃত্যুকে মুছে/আবার এসেছে বাংলাদেশের প্রাণ।
   - গ. জ্বলে-পুড়ে-মরে ছারখার/তবু মাথা নোয়াবার নয়।
   - ঘ শাবাশ বাংলাদেশ, এ পৃথিবী/ অবাক তাকিয়ে রয়;

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৪ ও ৫নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

বাংলার নিরীহ মানুষের মধ্যে নতুন প্রাণের সঞ্চার হয়েছে। দাবি আদায়ের প্রত্যয়দীপ্ত সংগ্রামে আজ ঐক্যবদ্ধ জাতি প্রাণ দেবার নেশায় দিশেহারা — এ ভাবটিই ফুটে উঠেছে কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের 'দুর্মর' কবিতার নিচের দুটি চরণে–

জ্বলে-পুড়ে-মরে ছারখার
তবু মাথা নোয়াবার নয়।

৪. 'বাংলার নিরীহ মানুষের মধ্যে নতুন প্রাণের সঞ্চার হয়েছে' – কবি এই নবজাগরণকে কী বলে অভিহিত করেছেন?

ক. পদ্মার উচ্ছ্বাস খ. সচেতনতার ধান
গ. রক্ত রঙিন ধান ঘ. বাংলাদেশের প্রাণ

৫. 'দাবি আদায়ের প্রত্যয়দীপ্ত সংগ্রামে আজ ঐক্যবন্ধ জাতি প্রাণ দেবার নেশায় দিশেহারা'–জাতির কোন সংগ্রামে এই উদ্ধৃতিটির প্রতিফলন ঘটেছে?

ক. ভাষা-আন্দোলনে খ. ৬ দফা আন্দোলনে
গ. মুক্তিযুদ্ধে ঘ. গণ-অভ্যুত্থানে

খ. সৃজনশীল প্রশ্ন

১. নিচের কবিতাংশটুকু পড় এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

শাবাশ বাংলাদেশ, এ পৃথিবী
অবাক তাকিয়ে রয়;
জ্বলে-পুড়ে-মরে ছারখার
তবু মাথা নোয়াবার নয়।

ক. বাঙালি মাথা নোয়ায়নি– এমন একটি তাৎপর্যময় ঘটনা উল্লেখ কর।
খ. উদ্দীপকটির মধ্যে যে চেতনার পরিচয় পাওয়া যায় তা ব্যাখ্যা কর।
গ. কবিতাংশের এই চেতনা তোমার পাঠ্যভুক্ত অন্য কোন কবিতার সঙ্গে সম্পর্কিত? সেই সম্পর্কের তুলনামূলক চিত্র আঁকো।
ঘ. উদ্ধৃতাংশ অবলম্বনে বাঙালি জাতির বিদ্রোহী সত্তার স্বরূপ বিশ্লেষণ কর।

স্বাধীনতা তুমি

শামসুর রাহমান

[**কবি-পরিচিতি** : শামসুর রাহমান ১৯২৯ সালের ২৪শে অক্টোবর ঢাকা শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পৈতৃক নিবাস নরসিংদী জেলার রায়পুরা থানার পাড়াতলী গ্রাম। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক এবং তাঁর পেশা ছিল সাংবাদিকতা। তিনি একনিষ্ঠভাবে কাব্য সাধনায় নিয়োজিত ছিলেন। বিশেষ করে মধ্যবিত্ত নাগরিক জীবনের প্রত্যাশা, হতাশা, বিচ্ছিন্নতা, বৈরাগ্য ও সংগ্রাম তাঁর কবিতায় সার্থকভাবে বিধৃত। তাঁর কবিতায় অতি আধুনিক কাব্যধারার বৈশিষ্ট্য সার্থকভাবে প্রকাশ পেয়েছে। উপমা ও চিত্রকল্পে তিনি প্রকৃতিনির্ভর এবং বিষয় ও উপাদানে শহরকেন্দ্রিক। তাঁর প্রধান কাব্যগ্রন্থ : *প্রথম গান দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে, রৌদ্র করোটিতে, বিধ্বস্ত নীলিমা, নিরালোকে দিব্যরথ, নিজ বাসভূমে, বন্দী শিবির থেকে, দুঃসময়ের মুখোমুখি, ফিরিয়ে নাও ঘাতক কাঁটা, এক ধরনের অহংকার, আদিগন্ত নগ্ন পদধ্বনি, আমি অনাহারী, বাংলাদেশ স্বপ্ন দ্যাখে. দেশদ্রোহী হতে ইচ্ছে করে, বুক তার বাংলাদেশের হৃদয়, গৃহযুদ্ধের আগে, হৃদয়ে আমার পৃথিবীর আলো, হরিণের হাড়, মানব হৃদয়ে নৈবেদ্য সাজাই* ইত্যাদি। এছাড়া তাঁর কিছু অনুবাদ-কবিতা ও শিশুতোষ কবিতা রয়েছে। তিনি ১৭ই আগস্ট, ২০০৬ সালে মৃত্যুবরণ করেন।]

স্বাধীনতা তুমি
রবি ঠাকুরের অজর কবিতা, অবিনাশী গান।
স্বাধীনতা তুমি
কাজী নজরুলের ঝাঁকড়া চুলের বাবরি দোলানো
মহান পুরুষ, সৃষ্টি সুখের উল্লাসে কাঁপা –
স্বাধীনতা তুমি
শহীদ মিনারে অমর একুশে ফেব্রুয়ারির উজ্জ্বল সভা।
স্বাধীনতা তুমি
পতাকা-শোভিত শ্লোগান-মুখর ঝাঁঝালো মিছিল।
স্বাধীনতা তুমি
ফসলের মাঠে কৃষকের হাসি
স্বাধীনতা তুমি
রোদেলা দুপুরে মধ্যপুকুরে গ্রাম্য মেয়ের অবাধ সাঁতার।
স্বাধীনতা তুমি
মজুর যুবার রোদে ঝলসিত দক্ষ বাহুর গ্রন্থিল পেশি।
স্বাধীনতা তুমি
অন্ধকারের খাঁ খাঁ সীমান্তে মুক্তিসেনার চোখের ঝিলিক।
স্বাধীনতা তুমি
বটের ছায়ায় তরুণ মেধাবী শিক্ষার্থীর
শাণিত কথার ঝলসানি-লাগা সতেজ ভাষণ।

স্বাধীনতা তুমি
চা-খানায় আর মাঠে-ময়দানে ঝোড়ো সংলাপ।
স্বাধীনতা তুমি
কালবৈশাখীর দিগন্তজোড়া মত্ত ঝাপটা।
স্বাধীনতা তুমি
শ্রাবণে অকূল মেঘনা বুক
স্বাধীনতা তুমি
পিতার কোমল জায়নামাযের উদার জমিন।
স্বাধীনতা তুমি
উঠানে ছড়ানো মায়ের শুভ্র শাড়ির কাঁপন।
স্বাধীনতা তুমি
বোনের হাতের নম্র পাতায় মেহেদির রং।
স্বাধীনতা তুমি
বন্ধুর হাতে তারার মতন জ্বলজ্বলে এক রাঙা পোস্টার।
স্বাধীনতা তুমি
গৃহিণীর ঘন কালো খোলা চুল,
হাওয়ায় হাওয়ায় বুনো উদ্দাম।
স্বাধীনতা তুমি
খোকার গায়ের রঙিন কোর্তা,
খুকির অমল তুলতুলে গালে
রৌদ্রের খেলা।
স্বাধীনতা তুমি
বাগানের ঘর, কোকিলের গান
বয়েসী বটের ঝিলমিলি পাতা,
যেমন ইচ্ছে লেখার আমার কবিতার খাতা।

অনুশীলনমূলক কাজ

উৎস

'স্বাধীনতা তুমি' কবিতাটি *বন্দী শিবির থেকে* কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত।

মূলবক্তব্য

আবহমান বাংলার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যে, সংগ্রামী মানুষের শৌর্যবীর্যে এবং বাংলাদেশের অনবদ্য প্রাকৃতিক জীবনের বিচিত্র চিত্রে কবি এ দেশের স্বাধীনতার শক্তি ও সৌন্দর্য অবলোকন করেছেন। কবি সামাজিক ও ব্যক্তি জীবনে এবং জাতীয় সত্তায় স্বাধীনতাকে কখনও কোমল, কখনও কঠোর রূপের প্রতীকে ধারণ করতে চেয়েছেন। কবি তাঁর লেখনীর মধ্যেও স্বাধীনতাকে সঞ্চরণশীল রেখেছেন। কবির এই ইচ্ছা সব বাঁধনের সীমা অতিক্রম করে গেছে। তাই কবি বলেছেন যে, স্বাধীনতা 'যেমন ইচেছ লেখার আমার কবিতার খাতা'। স্বাধীনতার স্বরূপটি চিরায়ত বাংলার জীবন ও প্রকৃতিতে যেন বিধৃত।

শব্দার্থ ও টীকা

অজর — জরারহিত, জরাগ্রস্ত নয় এমন। **অবিনাশী** — অক্ষয়। **পতাকা-শোভিত –** পতাকা দিয়ে সাজানো। **ঝাঁঝালো মিছিল** — বিক্ষুব্ধ মিছিল। **রোদেলা** — রৌদ্রোজ্জ্বল। **গ্রন্থিক**— গ্রন্থিযুক্ত। **মুক্তিসেনা** — দেশের মুক্তি বা স্বাধীনতার জন্য যে যুদ্ধ করে। **মেধাবী** — বুদ্ধিমান। **শাণিত** — ধারালো। **সংলাপ** — আলাপ। **কালবৈশাখী** — বৈশাখের ভয়াবহ ঝড়তুফান। **মত্ত** — মাতাল। **কোর্তা** — জামা। **বয়েসী** — অনেক বয়স হয়েছে এমন।

অনুশীলনী

ক. বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. স্বাধীনতাকে কবি শামসুর রাহমান কার হাসির সঙ্গে তুলনা করেছেন?

ক. খুকির　　খ. মায়ের
গ. কৃষকের　　ঘ. মুক্তিযোদ্ধার

২. 'স্বাধীনতা তুমি' কবিতায় কবি স্বাধীনতার সৌন্দর্য অবলোকন করেছেন–

i. সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও সংগ্রামী চেতনায়
ii. বাংলার জীবন ও প্রকৃতিতে
iii. বাংলার মানুষের শক্তি ও বাংলার সৌন্দর্যে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i　　খ. ii
গ. ii ও iii　　ঘ. i, ii ও iii

৩. 'স্বাধীনতা তুমি' কবিতায় নিচের কোন চিত্রকল্পের মধ্যে বিদ্রোহের আভাস পাওয়া যায়?

ক. ঝাঁকড়া চুল　　খ. অবাধ সাঁতার
গ. শাড়ির কাঁপন　　ঘ. খোলা চুল

৪. শামসুর রাহমান কোন ধরনের কবি?

ক. নাগরিক কবি
খ. প্রকৃতির কবি
গ. গ্রাম-বাংলার কবি
ঘ. বিদ্রোহের কবি

৫. 'স্বাধীনতা তুমি' কবিতাটির মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে –

ক. মুক্তির বার্তা
খ. সংগ্রামী চেতনা
গ. স্বাধীনতার সৌন্দর্য
ঘ. স্বাধীনতার প্রত্যাশা

খ. সৃজনশীল প্রশ্ন

১. নিচের কবিতাংশটুকু পড় এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

স্বাধীনতা তুমি
বন্ধুর হাতে তারার মতন জ্বলজ্বলে এক রাঙা পোস্টার।
স্বাধীনতা তুমি
গৃহিণীর ঘন কালো খোলা চুল,
হাওয়ায় হাওয়ায় বুনো উদ্দাম।

ক. এই কবিতাংশটির কবির নাম কী?
খ. 'রাঙা পোস্টার' কিসের প্রতীক?– ব্যাখ্যা কর।
গ. 'স্বাধীনতা তুমি বন্ধুর হাতে তারার মতন জ্বলজ্বলে এক রাঙা পোস্টার।'– এ উক্তিটিকে বাস্তব কোনো ঘটনার প্রেক্ষিতে ব্যাখ্যা কর।
ঘ. 'স্বাধীনতা তুমি গৃহিণীর ঘন কালো খোলা চুল,
হাওয়ায় হাওয়ায় বুনো উদ্দাম।'–এ অংশটুকুর তাৎপর্য বিচার-বিশ্লেষণ কর।

২. নিচের ছকটি দেখ এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

ক. 'স্বাধীনতা তুমি' কবিতাটি কবির কোন কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত?
খ. স্বাধীনতার আনন্দ ও সৌন্দর্য বলতে কী বোঝায়?
গ. উদ্ধৃত ছকটি 'স্বাধীনতা তুমি' কবিতার ক্ষেত্রে কীভাবে সার্থক? যৌক্তিক উপস্থাপন কর।
ঘ. 'স্বাধীনতা তুমি' কবিতার আলোকে ছকের প্রতিটি ধাপ মূল্যায়ন কর।

মাগো ওরা বলে

আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ

[**কবি-পরিচিতি :** আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দে বরিশাল শহরে জন্মগ্রহণ করে। তিনি ইংরেজি সাহিত্যে এম.এ. পাস করে কিছুদিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেন। পরে সিভিল সার্ভিসে যোগদান করে বিভিন্ন উচ্চপদে সমাসীন হন। কাব্যের আঙ্গিক গঠনে এবং শব্দযোজনার বিশিষ্ট কৌশল তাঁর স্বাতন্ত্র্য চিহ্নিত করে। তিনি লোকজ ঐতিহ্যের ব্যবহার করে ছড়ার আঙ্গিকে কবিতা লিখেছেন। প্রকৃতির রূপ ও রঙের বিচিত্রিত ছবিগুলো তাঁর কবিতাকে মাধুর্যমণ্ডিত করেছে। সমাজজীবনের নানা অসঙ্গতির বিরুদ্ধেও তিনি সোচ্চার ছিলেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থগুলো হল: *সাত নরীর হার, কখনো রং কখনো সুর, কমলের চোখ, আমি কিংবদন্তীর কথা বলছি, আমার সময়, সহিষ্ণু প্রতীক্ষা, বৃষ্টি ও সাহসী পুরুষের জন্য প্রার্থনা* ইত্যাদি। ২০০১ সালের ১৯শে মার্চ তিনি মৃত্যুবরণ করেন।]

"কুমড়ো ফুলে-ফুলে
নুয়ে পড়েছে লতাটা,
সজনে ডাঁটায়
ভরে গেছে গাছটা
আর আমি
ডালের বড়ি শুকিয়ে রেখেছি।
খোকা তুই কবে আসবি ?
কবে ছুটি ?"

চিঠিটা তার পকেটে ছিল
ছেঁড়া আর রক্তে ভেজা।

"মাগো, ওরা বলে
সবার কথা কেড়ে নেবে।
তোমার কোলে শুয়ে
গল্প শুনতে দেবে না।
বলো, মা,
তাই কি হয় ?
তাই তো আমার দেরি হচ্ছে।
তোমার জন্য
কথার ঝুরি নিয়ে
তবেই না বাড়ি ফিরব।
লক্ষ্মী মা,
রাগ কোরো না
মাত্র তো আর কটা দিন।"

"পাগল ছেলে !"
মা পড়ে আর হাসে,
"তোর ওপরে রাগ করতে পারি !"
নারকেলের চিড়ে কোটে
উড়কি ধানের মুড়কি ভাজে,
এটা-সেটা
আরও কত কী!
তার খোকা যে বাড়ি ফিরবে
ক্লান্ত খোকা।

কুমড়ো ফুল
শুকিয়ে গেছে,
ঝরে পড়েছে ডাঁটা।
পুঁই লতাটা নেতানো।

"খোকা এলি? "
ঝাপসা চোখে মা তাকায়
উঠানে-উঠানে
যেখানে খোকার শব
শকুনিরা ব্যবচ্ছেদ করে।

এখন
মার চোখে চৈত্রের রোদ
পুড়িয়ে দেয় শকুনীদের।
তারপর
দাওয়ায় বসে
মা আবার ধান ভানে,
বিন্নি ধানের খই ভাজে,
খোকা তার
কখন আসে কখন আসে।

এখন
মার চোখে শিশির-ভোর
স্নেহের রোদে ভিটে ভরেছে।

অনুশীলনমূলক কাজ

উৎস

'মাগো ওরা বলে' কবিতাটি ১৯৫৩ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। ১৯৫২ সালের একুশে ফ্রেব্রুয়ারির পটভূমিকায় কবিতাটি রচিত।

মূলবক্তব্য

বায়ান্নর ভাষা-আন্দোলনে যাঁরা শহীদ হয়েছিলেন তাঁদের প্রসঙ্গে কবিতাটি লেখা। পুলিশের গুলিতে নিহত সন্তানের জন্য মায়ের মনের তীব্র বেদনার কথা এখানে বিবৃত হয়েছে। শহরে প্রবাসী ছেলে মায়ের চিঠি পেয়েছে, গাঁয়ে মায়ের কাছে যাওয়ার জন্য। সেই চিঠি পকেটে নিয়েই রাজপথে পুলিশের গুলিতে নিহত হয়েছে সে। অপরদিকে মা ছেলের জন্য কত খাবার তৈরি করে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে। কিন্তু তার ছেলে আর কোনোদিনও ফিরে আসবে না। মায়ের ভাষার জন্য সে জীবন দিয়েছে। কিন্তু মায়ের প্রতীক্ষার তো শেষ নেই।

শব্দার্থ ও টীকা

ব্যবচ্ছেদ — মৃতদেহ কাটাকাটি করে মৃত্যুর কারণ বের করার পদ্ধতি। **দাওয়া** — বারান্দা।

সবার কথা কেড়ে নেবে — বাংলা ভাষার মর্যাদার জন্য বায়ান্নর ভাষা-আন্দোলন সংঘটিত হয়েছিল। তৎকালীন পাকিস্তানি শাসকেরা চেয়েছিল বাংলা ভাষাকে মর্যাদা না দিতে। কিন্তু তা নীরবে সহ্য না করে এ দেশের ছাত্র-জনতা প্রতিবাদী হয়ে উঠেছিল।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. মাগো ওরা বলে কবিতাটির প্রেক্ষাপট

ক. '৫২ –এর ভাষা-আন্দোলন
খ. '৬৬ –এর ছয় দফা আন্দোলন
গ. '৬৯ –এর গণঅভ্যুত্থান
ঘ. '৭১ –এর স্বাধীনতাযুদ্ধ

২. ছেলের চিঠি পেয়ে মা

ক. কাঁদে আর হাসে
খ. পড়ে আর হাসে
গ. পড়ে আর কাঁদে
ঘ. কাঁদে আর মূর্ছা যায়

নিচের পঙ্‌ক্তিগুলো পড় এবং ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও।

মা আবার ধান ভানে,
বিন্নি ধানের খই ভাজে,
খোকা তার
কখন আসে কখন আসে।

৩. পঙ্ক্তিগুলো কোন কবিতা থেকে উদ্ধৃত করা হয়েছে ?

ক. স্বাধীনতা তুমি খ. শহীদ স্মরণে

গ. মাগো ওরা বলে ঘ. ফেরা

৪. উদ্ধৃতাংশে প্রকাশ পেয়েছে ছেলের জন্য মায়ের-

i. আয়োজন

ii. স্নেহ-ভালবাসা

iii. প্রতীক্ষা

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i খ. ii

গ. i, ii ও iii ঘ. ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

ফেব্রুয়ারি ২১, ১৯৫২। রাজু বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ে। ঢাকা শহরে জারি হয় ১৪৪ ধারা। শুরু হলো মিছিল। রাজু তার বন্ধুদের সঙ্গে মিছিলে যোগ দেয়–ভঙ্গ করে ১৪৪ ধারা। পুলিশ মিছিলে গুলি ছোড়ে। অধিকার আদায় হল। রাজুর বন্ধুরা বাড়ি ফিরে এল। রাজুর মাকে পৌঁছে দেয় রক্তমাখা এক জামা ও একটি চিঠি। রাজুর মা বিশ্বাস করতে পারে না যে তার ছেলে ফিরে আসবে না–অপেক্ষা করতে থাকে অধীর আগ্রহে।

ক. উদ্ধৃতাংশে কোন আন্দোলনের কথা বলা হয়েছে ?

খ. রাজু বাড়ি ফিরে না আসার কারণ ব্যাখ্যা কর।

গ. উদ্ধৃতাংশের সঙ্গে তোমার পঠিত কোন কবিতার মিল লক্ষণীয় –যুক্তিসহ উপস্থাপন কর।

ঘ. ছেলের জন্য একজন মায়ের যে মমত্ব উদ্ধৃতাংশে প্রকাশ পেয়েছে তার স্বরূপ বিশ্লেষণ কর।

তোমাকে অভিবাদন, বাংলাদেশ

সৈয়দ শামসুল হক

[**কবি-পরিচিতি :** সৈয়দ শামসুল হক ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দে কুড়িগ্রাম শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ঢাকা কলেজিয়েট স্কুল থেকে ম্যাট্রিক, জগন্নাথ কলেজ থেকে ইন্টারমিডিয়েট ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়ে কিছুদিন পড়াশোনা করেন। একসময় পেশায় সাংবাদিকতাকে বেছে নিলেও পরবর্তী সময়ে তিনি সার্বক্ষণিক সাহিত্যকর্মে নিমগ্ন থেকে বৈচিত্র্যময় সম্ভারে বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন। তিনি কবিতা, গল্প, উপন্যাস ও নাটক রচনা করেছেন। তাঁর শিশুতোষ রচনাও রয়েছে। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে অবদানের জন্য তিনি বাংলা একাডেমী পুরস্কারসহ অনেক সাহিত্য-পুরস্কার লাভ করেছেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : *একদা এক রাজ্যে, বৈশাখে রচিত পঙ্ক্তিমালা, অগ্নি ও জলের কবিতা, রাজনৈতিক কবিতা;* গল্প : *শীত বিকেল, রক্তগোলাপ, আনন্দের মৃত্যু, জলেশ্বরীর গল্পগুলো;* উপন্যাস : *বৃষ্টি ও বিদ্রোহীগণ;* নাটক : *পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়, নূরুলদীনের সারাজীবন, ঈর্ষা* ; শিশুতোষ গ্রন্থ : *সীমান্তের সিংহাসন*।]

তোমাকে অভিবাদন, বাংলাদেশ,
তুমি ফিরে এসেছ তোমার মানচিত্রের ভেতরে
যার ওপর দিয়ে বয়ে যাচ্ছে তেরো শো নদীর ধারা ;
তোমাকে অভিবাদন, বাংলাদেশ,
তুমি ফিরে এসেছ তোমার করতলে পায়রাটির বুকে
যার ডানা এখন রক্ত আর অশ্রুতে ভেজা ;
তোমাকে অভিবাদন; বাংলাদেশ,
তুমি ফিরে এসেছ তোমার বৃষ্টিভেজা খড়ের কুটিরে
যার ছায়ায় কত দীর্ঘ অপেক্ষায় আছে সন্তান এবং স্বপ্ন ;
তোমাকে অভিবাদন, বাংলাদেশ,
তুমি ফিরে এসেছ তোমার নৌকার গলুইয়ে
যার গ্রীবা এখন ভবিষ্যতের দিকে কেটে চলেছে স্রোত ;
তোমাকে অভিবাদন, বাংলাদেশ,
তুমি ফিরে এসেছ তোমার মাছধরা জালের ভেতরে
যেখানে লেজে মারছে বাড়ি একটা রুপালি চিতল ;
তোমাকে অভিবাদন, বাংলাদেশ,
তুমি ফিরে এসেছ তোমার হালের লাঙলের ভেতরে
যার ফাল এখন চিরে চলেছে পৌষের নবান্নের দিকে ;
তোমাকে অভিবাদন, বাংলাদেশ,
তুমি ফিরে এসেছ তোমার নেহাই ও হাতুড়ির সংঘর্ষের ভেতরে
যার একেকটি স্ফুলিঙ্গো এখন আগুন ধরছে অন্ধকারে ;
তোমাকে অভিবাদন, বাংলাদেশ,
তুমি ফিরে এসেছ তোমার কবিতার উচচারণে
যার প্রতিটি শব্দ এখন হয়ে উঠছে বল্লমের রুপালি ফলা ;

তোমাকে অভিবাদন, বাংলাদেশ,
তুমি ফিরে এসেছ তোমার দোতারার টানটান তারের ভেতরে
যার প্রতিটি টঙ্কার এখন ইতিহাসকে ধ্বনিত করছে ;
তোমাকে অভিবাদন, বাংলাদেশ,
তুমি ফিরে এসেছ তোমার লাল সূর্য আঁকা পতাকার ভেতরে
যার আলোয় এখন রঞ্জিত হয়ে উঠছে সাহসী বদ্বীপ ;
তোমাকে অভিবাদন, বাংলাদেশ,
তুমি ফিরে এসেছ তোমার অনাহারী শিশুটির কাছে
যার মুঠোর ভেতরে এখন একটি ধানের বীজ ;
তোমাকে অভিবাদন, বাংলাদেশ,
তুমি ফিরে এসেছ তোমার প্লাবনের পর কোমল পলিমাটিতে
যেখানে এখন অনবরত পড়ছে কোটি কোটি পায়ের ছাপ।

অনুশীলনমূলক কাজ

উৎস

'তোমাকে অভিবাদন, বাংলাদেশ' কবিতাটি সৈয়দ শামসুল হক-এর *রাজনৈতিক কবিতা* (১৯৯১) থেকে নেওয়া হয়েছে।

মূলবক্তব্য

রক্তস্নাত সদ্যোজাত স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশকে কবি অভিবাদন জানিয়েছেন গভীর ভালোবাসা ও আবেগ দিয়ে। দীর্ঘদিনের সংগ্রাম, ত্যাগ-তিতিক্ষা আর নয় মাসের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর আমরা অর্জন করেছি স্বাধীনতা। এই স্বাধীনতার পুণ্যভূমি আমাদের প্রিয় বাংলাদেশ। এই স্বাধীন বাংলাদেশকে কবি স্বাগত জানিয়েছেন। দীর্ঘদিন পরাধীনতার গ্লানিমাখা এ দেশের মানুষ ছিল নিজদেশে পরবাসী। সে দেশটি স্বাধীনতা লাভের পর যেন নতুন ভূষণে আবার সেই আবহমান বাংলার শত শত নদীর স্রোতোধারায়, সবুজ শস্যখেতে, আপন মানচিত্রে ফিরে এসেছে। এখনো স্বাধীনতাযুদ্ধের রক্তের দাগ মোছেনি এ দেশের, তবু বিজয়ের আনন্দের অশ্রু ঝরছে তার। এ দেশ শান্তির দেশ, শ্বেত পায়রার মতো দেশটি যেন শান্তির প্রতীক। কিন্তু তার ডানায় লেগেছে যুদ্ধের ক্ষতচিহ্ন। সদ্য-স্বাধীন বাংলাদেশ আবার যেন ফিরে এসেছে তার চিরচেনা বৃষ্টিভেজা খড়ের কুটিরে, নৌকার গলুইয়ে, মাছের জালে, কৃষকের লাঙলের ফলায়। বাংলার মানুষ মুক্তিযুদ্ধে সংঘাতের স্ফুলিঙ্গ তুলেছিল, যেভাবে স্ফুলিঙ্গ ওঠে হাতুড়ি ও নেহাইয়ের সংঘর্ষে। বাংলাদেশ কবিতার দেশ। সেই সংগ্রামী বাঙালির কবিতার চরণের প্রতিটি শব্দ যেন বল্লমের ফলার মতো ক্ষুরধার হয়ে উঠেছিল।

বাঙালির মন-উদাস-করা দোতারায়ও একদিন উঠেছিল ইতিহাসের মন্দ্রিত সুর। এভাবে সংগ্রামে ও সুরে, যুদ্ধে ও ভালোবাসায় বাঙালি ফিরে পেয়েছে তার আপন মাতৃভূমি, পেয়েছে সবুজের মাঝখানে রক্তিম সূর্যের পতাকাখচিত দেশ। রক্তবন্যায় প্লাবিত এ দেশের পলিমাটিতে আবার জেগে উঠবে অফুরন্ত জীবনের বীজ, দীর্ঘদিনের লালিত স্বপ্নের আশায় ভাস্বর হবে এ দেশ।

শব্দার্থ ও টীকা

অভিবাদন – সালাম, নমস্কার, বন্দনা।

স্ফুলিঙ্গ – আগুনের ফিনকি বা ফুলকি। আগুনের কণা।

তেরো শো নদীর ধারা – বাংলাদেশে রয়েছে অসংখ্য নদী। জালের মতো বিস্তার করে আছে এসব নদী। তবে ভূগোলের হিসেবে বহতা এ নদীর সংখ্যা তেরো শো। এসব নদীর ধারে গড়ে উঠেছে বাংলার জনপদ। সুজলা-সুফলা, শস্য-শ্যামলা বাংলা, নদীর জলধারার ওপর নির্ভরশীল। এ দেশকে বলা হয় নদীমাতৃক দেশ।

ভবিষ্যতের দিকে কেটে চলেছে স্রোত – বাংলার জীবনধারার আরেকটি প্রয়োজনীয় উপকরণ নৌকা। নদীর স্রোতে চলার সময় নৌকার গলুই থাকে সমুখপানে। নদীর স্রোত কেটে চলে এই নৌকার গলুই। তাই সামনের দিকে চলার পথের প্রতীক হল এ গলুই।

নবান্ন – ঘরে নতুন অন্ন বা ফসল তোলার উৎসব। গ্রামবাংলার আবহমান জীবনধারা ও লোক-সংস্কৃতির সঙ্গে এ উৎসব অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। পৌষ মাসে ঘরে আউশের ফসল উঠলে বাংলার গৃহে আনন্দের প্লাবন আসে, তৈরি হয় নতুন চালের ফিরনি-পিঠে-পুলি।

সাহসী বদ্বীপ – বাংলাদেশ একটি বদ্বীপ অঞ্চল। বঙ্গোপসাগরের উত্তর দিকে শত বছরের শত শত নদীর পলিমাটি দিয়ে গড়ে উঠেছে এই জনপদ। এই জনপদের মানুষ সংগ্রামী বীর ও যোদ্ধা। ১৯৭১-এর মহান মুক্তিযুদ্ধে এই জনপদের মানুষ রক্তক্ষয়ী লড়াই করে দেশকে স্বাধীন করেছে, তাই কবি এ দেশকে বলেছেন – সাহসী বদ্বীপ।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। তুমি ফিরে এসেছ-
- ক. ঘরের কোণে
- খ. লাঙ্গলের ভিতরে
- গ. গাছের ডালে
- ঘ. সবুজ পাতায়

২. নবান্নের উৎসব বলতে কী বোঝায়-
- ক. বৈশাখ মাসের উৎসব
- খ. আশ্বিন মাসের উৎসব
- গ. ভাদ্র মাসের উৎসব
- ঘ. পৌষ মাসের উৎসব

উদ্দীপকটি পড়ে ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও।

“তুমি ফিরে এসেছ তোমার লাল সূর্য আঁকা পতাকার ভেতরে
যার আলোয় এখন রঞ্জিত হয়ে উঠছে সাহসী বদ্বীপ।

৩. লাল সূর্য আঁকা পতাকার ভেতরে বাংলাদেশের ফিরে আসার বিষয়টির পক্ষে তোমার মতামত কি ?
- i. অনেক ত্যাগ ও তিতিক্ষার মাধ্যমে বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটে
- ii. নানা চড়াই উৎরাইয়ের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটে
- iii. সাহসী বীরদের রক্তের স্বাক্ষরে বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটে

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i খ. ii

গ. iii ঘ. i ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

'তোমাকে অভিবাদন, বাংলাদেশ' কবিতায় কবি ভালোবাসা ও আবেগ দিয়ে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশকে অভিবাদন জানিয়েছেন। দীর্ঘ নয় মাসের সংগ্রাম, ত্যাগ ও রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে। দীর্ঘদিন এদেশের মানুষ ছিল নিজ দেশে পরবাসী। এদেশ শান্তির দেশ, শান্তির প্রতীক। কিন্তু তার ডানায় লেগেছে যুদ্ধের ক্ষতচিহ্ন। স্বাধীন বাংলাদেশ আবার ফিরে এসেছে বৃষ্টিভেজা খড়ের কুটিরে, নৌকার গলুইয়ে, মাছের জালে, কৃষকের লাঙ্গালের ফলায়। বাংলাদেশ কবিতার দেশ, গানের দেশ। সংগ্রামে ও সুরে, যুদ্ধে ও ভালোবাসায় বাঙালি ফিরে পেয়েছে তার আপন মাতৃভূমি।

ক. 'তোমাকে অভিবাদন, বাংলাদেশ' –এর রচয়িতা কে ?

খ. বাংলাদেশের কী পরিবর্তন হয়েছে? লেখক এই পরিবর্তনকে কীভাবে দেখিয়েছেন ?

গ. 'স্বাধীন বাংলাদেশ আবার ফিরে এসেছে বৃষ্টিভেজা খড়ের কুটিরে, নৌকার গলুইয়ে, মাছের জালে, কৃষকের লাঙ্গালের ফলায়–উদ্দীপকটির পক্ষে তোমার মতামত দাও।

ঘ. বাংলাদেশ কবিতার দেশ, গানের দেশ– এ উক্তির আলোকে উদ্দীপকের মূলভাব বিশ্লেষণ কর।

তিতাস

আল মাহমুদ

[**কবি-পরিচিতি :** আল মাহমুদ ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দে ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার মোড়াইল গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর প্রকৃত নাম মীর আবদুস শুকুর আল মাহমুদ। তিনি দীর্ঘকাল সাংবাদিকতা পেশার সঙ্গে জড়িত ছিলেন। পরে তিনি বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমীতে যোগদান করেন এবং পরিচালকের পদ থেকে অবসর গ্রহণ করেন। মুক্তিযুদ্ধ তাঁকে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করে। স্বাধীনতার পর তিনি 'দৈনিক গণকণ্ঠ' পত্রিকার সম্পাদক নিযুক্ত হন। তাঁর কবিতায় লোকজ শব্দের সুনিপুণ প্রয়োগ যেমন লক্ষণীয় তেমনি রয়েছে ঐতিহ্যপ্রীতি। তাঁর প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ : *লোক লোকান্তর, কালের কলস, সোনালী কাবিন, মায়াবী পর্দা দুলে ওঠো, আরব্য রজনীর রাজহাঁস, বখতিয়ারের ঘোড়া* ইত্যাদি। কথাসাহিত্য : *পানকৌড়ির রক্ত*। *পাখির কাছে ফুলের কাছে* তাঁর শিশুতোষ কবিতার বই।]

এ আমার শৈশবের নদী, এই জলের প্রহার
সারাদিন তীর ভাঙে, পাক খায়, ঘোলা স্রোত টানে
যৌবনের প্রতীকের মতো অসংখ্য নৌকার পালে
গতির প্রবাহ হানে। মাটির কলসে জল ভরে
ঘরে ফিরে সলিমের বউ তার ভিজে দুটি পায়।
অদূরের বিল থেকে পানকৌড়ি, মাছরাঙা, বক
পাখায় জলের ফোঁটা ফেলে দিয়ে উড়ে যায় দূরে;
জনপদে কী অধীর কোলাহল মায়াবী এ নদী
এনেছে স্রোতের মতো, আমি তার খুঁজিনি কিছুই।

কিছুই খুঁজিনি আমি, যতবার এসেছি এ তীরে
নীরব তৃপ্তির জন্য আনমনে বসে থেকে ঘাসে
নির্মল বাতাস টেনে বহুক্ষণ ভরেছি এ বুক।
একটি কাশের ফুল তারপর আঙুলে আমার
ছিঁড়ে নিয়ে এই পথে হেঁটে চলে গেছি। শহরের
শেষ প্রান্তে যেখানে আমার ঘর, নরম বিছানা,
সেখানে রেখেছি দেহ। অবসাদে ঘুম নেমে এলে
আবার দেখেছি সেই ঝিকিমিকি শবরী তিতাস
কী গভীর জলধারা ছড়াল সে হৃদয়ে আমার।
সোনার বৈঠার ঘায়ে পবনের নাও যেন আমি
বেয়ে নিয়ে চলি একা অলৌকিক যৌবনের দেশে।

অনুশীলনমূলক কাজ

উৎস

'তিতাস' কবিতাটি *লোক লোকান্তর* কাব্যগ্রন্থ থেকে সংগৃহীত। কবি এ কবিতায় তাঁর স্মৃতিময় তিতাস নদীর বর্ণনায় আবেগে উচ্ছ্বসিত হয়েছেন।

মূলবক্তব্য

তিতাস কবির শৈশবের স্মৃতির নদী। তিতাসের প্রবল ঢেউয়ের তোড়ে পাড় ভাঙে। বহমান স্রোতের টানে অসংখ্য নৌকায় গতি সঞ্চারিত হয়। তিতাসের দু তীরের দৃশ্যাবলি মনোহারিণী। অদূরের বিল থেকে মাছরাঙা, পানকৌড়ি ও বকের সারি নদীর ওপর দিয়ে উড়ে চলে। এ নদী তার স্রোতের মতোই জনপদে সৃষ্টি করে জীবনচাঞ্চল্য। তিতাসের তীরে বসে অপার আনন্দে কবির হৃদয় ভরে উঠেছে। ঘরে ফেরার পর ক্লান্তদেহে ঘুম নেমে এলেও তিতাসই কবির দৃষ্টি জুড়ে থাকে।

শব্দার্থ ও টীকা

প্রতীক – চিহ্ন। **প্রবাহ** – স্রোত, অবিচ্ছিন্ন গতি। **মায়াবী** – মায়াযুক্ত, জাদুকর। **আনমনে** – অন্যমনে, অন্যমনস্কভাবে। **শবরী** – শিকারি, ব্যাধ।

শৈশবের নদী – তিতাস নদীর পাড়ে গড়ে উঠেছে ব্রাহ্মণবাড়িয়া শহর। কবি এ শহরে জন্মগ্রহণ করেছেন। এ নদীর সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটেছে শৈশব থেকেই। দিনে দিনে এ পরিচয় নিবিড় হয়েছে।

যৌবনের প্রতীক – কবি তিতাসের বুকে ভেসে-যাওয়া পাল-তোলা অসংখ্য নৌকাকে যৌবনের প্রতীক হিসেবে দেখেছেন। প্রবল স্রোতের টানে বাতাসের তীব্র বেগে নদীর বুকে নৌকা ছুটে চলে। কবি এই ছুটে চলার মধ্যে যৌবনের গতিবেগ লক্ষ করেছেন।

নীরব তৃপ্তি – কবি তিতাসের তীরে চুপচাপ বসে থেকেছেন। তিতাসের সৌন্দর্য তাঁকে আনমনা করেছে। এক নিবিড় প্রশান্তিতে তাঁর হৃদয়-মন ভরে উঠেছে। কবি হৃদয়ের এই প্রশান্তিকেই নীরব তৃপ্তি বলেছেন।

অনুশীলনী

ক. বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

নিচের অংশটুকু পড়ে ১, ২ ও ৩ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

> জনপদে কী অধীর কোলাহল মায়াবী এ নদী
> এনেছে স্রোতের মতো, আমি তার খুঁজিনি কিছুই।
>
> কিছুই খুঁজিনি আমি, যতবার এসেছি এ তীরে
> নীরব তৃপ্তির জন্য আনমনে বসে থেকে ঘাসে
> নির্মল বাতাস টেনে বহুক্ষণ ভরেছি এ বুক।

১. জনপদে 'তিতাস' কী প্রভাব ফেলেছে?

ক. পরিতৃপ্তির ছোঁয়া খ. প্রকৃতির নীরবতা
গ. মমত্ববোধ ঘ. কর্মচাঞ্চল্য

২. কবি মায়াবী নদীর কাছে কী প্রত্যাশা করেছেন?

ক. নিরবচ্ছিন্ন প্রশান্তি খ. হিমেল বাতাস

গ. জলের স্রোত ঘ. মমতার স্পর্শ

৩. 'তিতাস' কবিতায় মূলত প্রকাশ পেয়েছে –

ক. কবির শৈশবস্মৃতি খ. তিতাসের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য

গ. প্রকৃতির প্রতি মমত্ববোধ ঘ. কবির দেশপ্রেমবোধ

৪. 'তিতাস' কবিতার তাৎপর্যপূর্ণ বৈশিষ্ট্য –

ক. লোকজ উপকরণের ব্যবহার খ. নাগরিক উপকরণের ব্যবহার

গ. তৎসম শব্দের ব্যবহার ঘ. সমাসবদ্ধ শব্দের ব্যবহার

খ. সৃজনশীল প্রশ্ন

১. নিচের অংশটুকু পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

নদীর নাম 'আন্ধারমানিক'। নদীর স্রোতে যৌবনের প্রতীকের মতো অসংখ্য পালতোলা নৌকা ছুটে যায় গন্তব্যের দিকে। নদীর পানিতে দৈনন্দিন কাজ সারে গাঁয়ের মেয়েরা। অসংখ্য নাম জানা-নাজানা পাখি নদীর কাছে আসে, আর উড়ে যায়। নদীর দুধারে কাশবন। নদীর পাশ দিয়ে গাঁয়ের পথ গ্রাম্য হাটের কাছে গিয়ে মিশেছে। যতবার এ নদীর তীরে আমি এসেছি নীরব তৃপ্তির জন্য, ততবারই নির্মল বাতাস টেনে বুক ভরেছি।

ক. তোমার পাঠ্যবইয়ের কোন কবিতাটির নামকরণ হয়েছে নদীর নামে?

খ. যৌবনের প্রতীক বলতে অনুচ্ছেদে কী বোঝানো হয়েছে?

গ. অনুচ্ছেদের বিষয়বস্তু তোমার পঠিত কবিতার বিষয়বস্তুর সঙ্গে কীভাবে সাদৃশ্যপূর্ণ? যুক্তিসহ উপস্থাপন কর।

ঘ. 'যতবার এ নদীর তীরে আমি এসেছি নীরব তৃপ্তির জন্য-ততবারই নির্মল বাতাস টেনে বুকে ভরেছি'– এ উক্তিটি তোমার পঠিত কবিতার আলোকে বিশ্লেষণ কর।

শহীদ স্মরণে

মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান

[**কবি-পরিচিতি :** মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান ১৯৩৯ খ্রিষ্টাব্দের ৬ই এপ্রিল যশোর শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে বি.এ. অনার্স (১৯৫৮) এবং এম.এ.(১৯৫৯) উভয় পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হন। পাস করার পরই (১৯৫৯ সাল) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে প্রথম ফেলো হিসেবে যোগদান করেন। তিনি ১৯৬৯ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেন। ১৯৭৫ সালে প্রফেসর পদে উন্নীত হন। ১৯৭৮-৮১ সন পর্যন্ত তিনি এই বিভাগের চেয়ারম্যান ছিলেন। তিনি মূলত কবি ও গীতিকার। গবেষক হিসেবেও তিনি প্রখ্যাত। ঋজু বক্তব্য, ছন্দসচেতনতা ও গীতিময়তা তাঁর কবিতার বৈশিষ্ট্য। তিনি দেশ ও কালসচেতন কবি। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ তাঁর কবিতায় বিশিষ্ট অনুপ্রেরণা সঞ্চার করেছে। তাঁর উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ : *দুর্লভ দিন, শঙ্কিত আলোকে, বিপন্ন বিষাদ, প্রতনু প্রত্যাশা, ভালোবাসার হাতে, মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান কাব্যসংগ্রহ, কোলাহলের পর, ধীর প্রবাহ, ভাষাময় প্রজাপতি* ; অনুবাদ : *এমেলি ডিকিনসনের কবিতা, অশান্ত অশোক* ; গবেষণা : *আধুনিক বাংলা কাব্যে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক, আধুনিক বাংলা সাহিত্য, বাংলা কবিতার ছন্দ, আধুনিক কাহিনীকাব্যে মুসলিম জীবন ও চিত্র, বাংলা সাহিত্যে উচ্চতর গবেষণা, সাময়িকপত্রে সাহিত্যচিন্তা : সওগাত, আধুনিক বাংলা কবিতা : প্রাসঙ্গিকতা ও পরিপ্রেক্ষিত, রবীন্দ্রচেতনা, মধুসূদন ইত্যাদি। ৩রা সেপ্টেম্বর, ২০০৮ তারিখে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।]*

কবিতায় আর কী লিখব ?
যখন বুকের রক্তে লিখেছি
একটি নাম
বাংলাদেশ।

গানে আর ভিন্ন কী সুরের ব্যঞ্জনা ?
যখন হানাদারবধ সংগীতে
ঘৃণার প্রবল মন্ত্রে জাগ্রত
স্বদেশের তরুণ হাতে
নিত্য বেজেছে অবিরাম
মেশিনগান, মর্টার, গ্রেনেড।

কবিতায় কী লিখব ?
যখন আসাদ
মনিরামপুরের প্রবল শ্যামল
হৃদয়ের তপ্ত রুধিরে করেছে রঞ্জিত
সারা বাংলায় আজ উড্ডীন
সেই রক্তাক্ত পতাকা।
আসাদের মৃত্যুতে আমি
অশ্রুহীন; অশোক; কেননা
নয়ন কেবল ব্রজবর্ষী; কেননা

আমার বৃদ্ধ পিতার শরীরে
এখন পশুদের প্রহারের
চিহ্ন; কেননা আমার বৃদ্ধা মাতার
কন্ঠে নেই আর্ত হাহাকার, নেই
অভিসম্পাত – কেবল
দুর্মর ঘৃণার আগুন; কোনো
সান্ত্বনাবাক্য নয়, নয় কোনো
বিমর্ষ বিলাপ; তাঁকে বলিনি
'তোমার ছেলে আসল ফিরে
হাজার ছেলে হয়ে,
আর কেঁদো না মা'; কেননা
মা তো কাঁদে না;
মার চোখে নেই অশ্রু, কেবল
অনলজ্বালা, দু চোখে তাঁর
শত্রুহননের আহ্বান।

আসাদের রক্তধারায় মহৎ
কবিতার, সব মহাকাব্যের,
আদি অনাদি আবেগ–
বাংলাদেশ – জাগ্রত।

আমি কবিতায় নতুন আর
কী বলব ? যখন মতিউর
করাচির খাঁচা ছিঁড়ে ছুটে গেল
মহাশূন্যে টি-৩৩ বিমানের
দুর্দম পাখায় তার স্বপ্নের
স্বাধীন স্বদেশ মনে করে–
ফেলে তার মাহিন তুহিন মিলি
সর্বস্ব সম্পদ; পরম আশ্চর্য এক
কবিতার ইন্দ্রজাল স্রষ্টা হল–
তার অধিক কবিতা আর
কোন বঙ্গাভাষী কবে লিখেছে কোথায় ?

আমি কোন শহীদের স্মরণে লিখব ?
বায়ান্ন, বাষট্টি, উনসত্তর, একাত্তর;
বাংলার লক্ষ লক্ষ আসাদ মতিউর আজ
বুকের শোণিতে উর্বর করেছে এই
প্রগাঢ় শ্যামল।

শহীদের পুণ্য রক্তে সাত কোটি
বাঙালির প্রাণের আবেগ আজ
পুষ্পিত সৌরভ। বাংলার নগর, বন্দর,
গঞ্জ, বাষট্টি হাজার গ্রাম
ধ্বংসস্তূপের থেকে সাত কোটি ফুল
হয়ে ফোটে। প্রাণময় মহৎ কবিতা
আর কোথাও দেখি না এর চেয়ে।

শব্দভুক পদ্যব্যবসায়ী ভীরু বজ্ঞাজ পুঙ্গাব সব
এই মহাকাব্যের কাননে খোঁজে
নতুন বিস্ময়। কলমের সাথে আজ
কবির দুর্জয় হাতে নির্ভুল স্টেনগান কথা বলে।
কবিতায় আর নতুন কী লিখব ?
যখন বুকের রক্তে
লিখেছি একটি নাম
বাংলাদেশ।

অনুশীলনমূলক কাজ

উৎস

'শহীদ স্মরণে' ১৯৭১ সালের ডিসেম্বর মাসে রচিত এবং কবির *প্রতনু প্রত্যাশা* কাব্যগ্রন্থ থেকে গৃহীত। কবি এই কবিতায় বাংলাদেশের রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধে এ দেশের অগণিত বীর সন্তানের মহান আত্মত্যাগের মহিমাকে ফুটিয়ে তুলেছেন।

মূলবক্তব্য

এ কবিতাটি ১৯৭১ সালের বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পটভূমিতে রচিত। কবির অনুভবে ও অভিজ্ঞতায় একাত্তরের রক্তস্নাত স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় যেন এক মূর্তিমান কবিতা। 'বাংলাদেশ'-এ দেশের অগণিত বীর শহীদের বুকের রক্তে লেখা একটি নাম। কবিতায় সেদিনের সেই মহৎ প্রেরণা ও আবেগ ধরে রাখা সম্ভব নয়। সন্তানহারা মাতা ও পিতার দৃষ্টিতে ঘৃণার যে আগুন এবং কণ্ঠে যে শত্রুহননের আহ্বান তা কবিতার বাণীর চেয়ে অনেক বেশি শক্তি ধারণ করে। এ কারণেই জাতির রক্তলেখায় নির্মিত স্বাধীন বাংলাদেশ কবির কাছে তাৎপর্য বহন করে। কবি তাই নিঃসংকোচে ও দ্বিধাহীন চিত্তে উচ্চারণ করতে পারেন – 'প্রাণময় মহৎ কবিতা আর কোথাও দেখি না এর চেয়ে।'
কবিতাটি মূলত কবির ব্যক্তিজীবনের অভিজ্ঞতাভিত্তিক হলেও এতে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের মর্মকথা অভিব্যক্ত হয়েছে। পৃথিবীতে বাঙালি

এতকাল 'শব্দভুক পদ্যব্যবসায়ী ভীরু'; অর্থাৎ কবিও ভীরু অপবাদে পরিচিত ছিলেন। আজ সেই মিথ্যা পরিচয় ঘুচিয়ে বাঙালি নতুন আত্মপরিচয়ে জেগে উঠেছে। আজ সেই অপবাদের নির্মোক ছিঁড়ে বাঙালি মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে বীরের জাতির পরিচয়ে দীপ্ত। বাঙালির এই নতুন পরিচয়কে 'নতুন বিস্ময়' বলে চিহ্নিত করছেন; কেননা কবি লক্ষ করছেন যে কবিও মুক্তিযোদ্ধা। তাই 'কলমের সাথে আজ/কবির দুর্জয় হাতে নির্ভুল স্টেনগান কথা বলে'। বাঙালি কবি বীর বাঙালির এই প্রকৃত আত্মপরিচয়ে গর্বিত ও গৌরবান্বিত। মুক্তিযুদ্ধ বাঙালিকে এই আত্মপরিচয়ে ভাস্বর করেছে বলে কবি এই উপলব্ধির মধ্যে বাঙালির প্রকৃত মহিমাকে খুঁজে পাচ্ছেন। এই মহাকাব্যিক উপলব্ধি হয়েছে বলেই কবিতায় আর তাঁর নতুন করে কিছু বলার নেই। বাঙালির বীরত্বপূর্ণ আত্মপরিচয় তাঁকে মহাকাব্যিক নায়কের মর্যাদা দিয়েছে। আজ সেই মর্যাদায় তিনি ভূষিত।

শব্দার্থ ও টীকা

হানাদার – আক্রমণকারী, এখানে তৎকালীন পাকিস্তানের সৈন্যবাহিনীকে বোঝানো হয়েছে। অভিসম্পাত – অভিশাপ। **বিমর্ষ** – বিষণ্ন, ম্লান। **শোণিত** – রক্ত। **ব্যঞ্জনা** – প্রকাশ, দ্যোতনা। **রুধির** – রক্ত। **রঞ্জিত** – রং মাখানো, এখানে রক্তে রঞ্জিত। **বজ্রবর্ষী** – বজ্রবর্ষণ করে যে। **দুর্মর** – যা মরে না। **শত্রুহনন** – শত্রুকে হত্যা করে। **বঙ্গজ** – যার বঙ্গে জন্ম হয়েছে। **পুঙ্গব** – বৃষ, শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি।

আসাদ - মোহাম্মদ আসাদউজ্জামান, কবির কনিষ্ঠ ভ্রাতা। ১৯৭১ সালে যশোর মাইকেল মধুসূদন কলেজের ছাত্র সংসদের সহসভাপতি ছিলেন। তিনি মুক্তিযুদ্ধে শহীদ হন।

মনিরামপুর – যশোর জেলার অন্যতম থানাশহর। এখানে ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের একপর্যায়ে মোহাম্মদ আসাদউজ্জামান তাঁর অন্যান্য সহযোদ্ধাদের সঙ্গে রাজাকারদের হাতে শহীদ হন।

মাহিন, তুহিন ও মিলি – মিলি বীরশ্রেষ্ঠ শহীদ মতিউরের স্ত্রী। মাহিন ও তুহিন–মতিউর ও মিলির কন্যাদ্বয়।

শব্দভুক পদ্যব্যবসায়ী – এখানে কবিদের শব্দভুক বলা হয়েছে। বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের সুবিশাল প্রেক্ষাপট ও এর তাৎপর্যকে উপস্থাপনার ক্ষেত্রে কবিদের অসহায়তা ও সীমাবদ্ধতার কথা বলা হয়েছে।

বায়ান্ন – ১৯৫২ সালে মাতৃভাষা বাংলাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদার দাবিতে ঐ ঐতিহাসিক আন্দোলন সংঘটিত হয়। এ আন্দোলনে সালাম, বরকত, রফিক, জব্বার ও সফিউরসহ অনেক ছাত্রজনতা শহীদ হন।

বাষট্টি – ১৯৬২ সালে গণমুখী শিক্ষা প্রতিষ্ঠার ও হামদুর রহমান শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট বাতিলের দাবিতে ছাত্রজনতা সামরিক সরকারের বিরুদ্ধে প্রবল গণআন্দোলন গড়ে তোলে। এ আন্দোলনে শহীদ হন মোস্তফা ওয়াজিউল্লাহ ও বাবুল।

উনসত্তর – ১৯৬৯ সালে জাতীয় দাবি ৬ দফা সংবলিত ছাত্রসমাজের ১১- দফা দাবি আদায়ের জন্য এ আন্দোলন সংগঠিত হয়। অবশেষে গণঅভ্যুত্থানের মুখে স্বৈর একনায়ক আয়ুব খান পদত্যাগ করতে বাধ্য হন।

একাত্তর – ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন, ৬২ এর গণশিক্ষা আন্দোলন-৬৯-এর গণ অভ্যুত্থানের ধারাবাহিকতায় ১৯৭১ সালে জাতীয় স্বাধীনতার জন্য শুরু হয় সশস্ত্র মুক্তিসংগ্রাম। এই সংগ্রামে পুরো বাঙালি জাতি ঝাঁপিয়ে পড়ে। দীর্ঘ নয় মাসের রক্তক্ষয়ী লড়াইয়ের মাধ্যমে অবশেষে ৩০ লাখ শহীদের রক্ত ও ২ লাখ লাঞ্ছিত মা-বোনের সম্ভ্রমের বিনিময়ে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের অভ্যুদয় হয়।

অনুশীলনী

ক. বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. 'শহীদ' স্মরণে' কবিতাটি কোন কাব্যগ্রন্থ থেকে নেওয়া হয়েছে ?

ক. দুর্লভ দিন খ. বিপন্ন বিষাদ

গ. প্রতনু প্রত্যাশা ঘ. ভালোবাসার হাতে

২. কবি কোন শহীদের কথা স্মরণ করেছেন?

ক. একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের শহীদ

খ. বায়ান্নর ভাষা-আন্দোলনের শহীদ

গ. উনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থানের শহীদ

ঘ. বায়ান্ন থেকে একাত্তরের সকল শহীদ

৩. শহীদ স্মরণে কবিতায় উল্লিখিত আসাদ শহীদ হয়েছেন –

ক. ১৯৫২ সনে ভাষা-আন্দোলনে

খ. ১৯৬৬ সনে ৬ দফা-আন্দোলনে

গ. ১৯৬৯ সনে গণ-অভ্যুত্থানে

ঘ. ১৯৭১ সনে স্বাধীনতা যুদ্ধে

নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ৪ ও ৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

শহীদের পুণ্য রক্তে সাত কোটি
বাঙালির প্রাণের আবেগ আজ
পুষ্পিত সৌরভ। বাংলার নগর, বন্দর,
গঞ্জ, বাষট্টি হাজার গ্রাম
ধ্বংসস্তূপের থেকে সাত কোটি ফুল
হয়ে ফোটে। প্রাণময় মহৎ কবিতা
আর কোথাও দেখি না এর চেয়ে।

৪. 'মহৎ কবিতা' বলতে কী বোঝানো হয়েছে?

ক. শহীদের ত্যাগের চেতনায় বিকশিত বাঙালি

খ. আত্মত্যাগে মহীয়ান শহীদ

গ. শহীদদের উদ্দেশে রচিত কবিতা

ঘ. শহীদের আত্মত্যাগে স্বাধীন বাংলাদেশ

৫. উদ্ধৃতিটি কবির কোন স্মৃতি বহন করে?

ক. যুদ্ধোত্তর বিজয়ের স্মৃতি খ. স্বাধীনতা যুদ্ধের স্মৃতি

গ. ৬৯-এর গণ-অভ্যুত্থানের স্মৃতি ঘ. সকল গণতান্ত্রিক আন্দোলনের স্মৃতি

খ. সৃজনশীল প্রশ্ন

১. নিচের কবিতাংশটুকু পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

শহীদের পুণ্য রক্তে সাত কোটি
বাঙালির প্রাণের আবেগ আজ
পুষ্পিত সৌরভ। বাংলার নগর, বন্দর
গঞ্জ, বাষট্টি হাজার গ্রাম
ধ্বংসস্তূপের থেকে সাত কোটি ফুল
হয়ে ফোটে। প্রাণময় মহৎ কবিতা
আর কোথাও দেখি না এর চেয়ে।

ক. উদ্ধৃতিটি কোন্ কবিতা থেকে নেওয়া হয়েছে?

খ. 'ধ্বংসস্তূপের থেকে সাত কোটি ফুল' বলতে কী বোঝানো হয়েছে?– ব্যাখ্যা কর।

গ. শহীদের পুণ্য রক্তের অঙ্গীকার গণতান্ত্রিক আন্দোলনে কীভাবে ভূমিকা রাখছে? তোমার মতামতের যৌক্তিকতা তুলে ধর।

ঘ. 'প্রাণময় মহৎ কবিতা আর কোথাও দেখি না এর চেয়ে।'– উক্তিটির তাৎপর্য বিশ্লেষণ কর।

দারিদ্র্যমুক্ত বাংলাদেশ গড়তে হলে শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে
– মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

কারও মনে কষ্ট দিও না

২০১০ শিক্ষাবর্ষ থেকে সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য